Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13
বিজ্ঞান মনস্ক'র ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সমীক্ষণ

একাদশ বর্ষ❖সংখ্যা - ৩❖সেপ্টেম্বর ২০২১

■ সম্পাদকীয় ঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লাগাতার বন্ধ রাখার আসল কারণ কি মহামারি প্রতিরোধ?
■ বছর বছর ত্রাণের জন্য হাত পাতা নয়, পরিত্রাণ চাই
■ ভারত কী করে ভাইরাস মোকাবিলা করে টিকে থাকবে?
■ লক ডাউনে কেমন আছি

অমরনাথের শিবলিঙ্গ কি অলৌকিকতার নিদর্শন ?

অস্ট্রিয়ায় পৃথিবীর বৃহত্তম বরফ গুহা

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ বিশেষ নিবন্ধ ঃ ৪
◆ বছর বছর ত্রাণের জন্য হাত পাতা নয়, পরিত্রাণ চাই!

◈ চয়ন ঃ ১০
◆ ভারত কী করে ভাইরাস মোকাবিলা করে টিকে থাকবে ?

◈ সমাজ দর্পণ ঃ ১২
◆ লখিন্দরের ভেলা আজও ভাসে জলে!

◈ ধর্মবিশ্বাস বনাম বিজ্ঞান ঃ ১৪
◆ অমরনাথের শিবলিঙ্গ কি অলৌকিকতার নিদর্শন?

◈ কুসংস্কার টিঁকিয়ে রাখে কারা ঃ ১৫
◆ ধর্মকে বিজ্ঞানের মোড়কে প্রচার

◈ উপেক্ষিত বিজ্ঞানী রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন ১৭

◈ রিপোর্ট ঃ ১৮
◆ পরমাণু বোমার বিপদ এড়াতে চাই পুঁজিবাদের অবসান
◆ একটি মরনোত্তর দেহদানের ইচ্ছা ও কিছু প্রশ্ন

◈ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ২৩
মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবন্ধ ঃ ২৬
◆ লক ডাউনে কেমন আছি

◈ বিজ্ঞানের খবর ২৯

◈ পাঠকের কলাম ঃ ৩৩
◆ আয়ুষ চিকিৎসাকে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সমমর্যাদা দান

◈ করোনা মহামারির দিনলিপি ৩৪

◈ সংগঠন সংবাদ ৩৫

◈ অনুসন্ধান রিপোর্ট ঃ ৩৮
◆ গণ-ডেপুটেশন অভিযানে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া

সম্পাদকীয় ঃ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লাগাতার বন্ধ রাখার আসল কারণ কি মহামারি প্রতিরোধ?

২০২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মহামারি 'মোকাবিলায়' সেই যে নাটকীয় ঘোষণা করা হল 'লকডাউন' – তার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী শিকার হল শিক্ষাব্যবস্থা। বিভিন্ন রাজ্যে ২০২০-র শেষার্ধে বা এই বছরের প্রথমার্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার চেষ্টা দেখা গেলেও পশ্চিমবঙ্গে স্কুল-কলেজে এমন পোক্ত তালা লাগানো হয়েছে যে উপস্থিত ঘোষণামত দুর্গাপূজোর ছুটি শেষ হবার আগে সেটা খোলার কথা বিবেচনাতেও আনা যাবে না।

বর্তমান সমাজে প্রত্যেক ঘটনা, সে সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মত বিদ্যমান থাকে। সাধারণ জনজীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে জনগণের মতামত নির্ভর করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা। অর্থনৈতিক অবস্থাই সামাজিক অবস্থান – সামাজিক মতামত স্থির করে দেয়। মহামারি পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া উচিৎ কিনা এই প্রশ্নে অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী অবস্থান স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সমাজের স্বচ্ছল অংশ যাঁরা সন্তানকে মূলতঃ বেসরকারী (প্রধানতঃ ইংরাজি মাধ্যম) বিদ্যালয়ে পড়ান – তাঁদের বড় অংশের মত হল করোনা সংক্রমণের ন্যূনতম সম্ভাবনা যতদিন থাকবে, সকলের টিকাকরণ যতদিন না সম্পূর্ণ হবে – ততদিন অন্ততঃ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত স্কুল খোলা উচিৎ নয়। এই পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা মোবাইল বা ল্যাপটপের মাধ্যমে স্কুল ও গৃহশিক্ষকদের কাছ থেকে অনলাইনে যথাসম্ভব পড়াশুনা করছেন।

কিন্তু শিক্ষা বিষয়ক অবস্থার বাৎসরিক রিপোর্ট (Annual Status of Education Report - ASER) বলছে সরকারী বা সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কেলমাত্র ৮.১% অনলাইনে পাঠ গ্রহণ করতে সক্ষম। [কেবল 'স্মার্ট ফোন' থাকলেই হয় না। নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য বাড়তি টাকা চাই, পাঠগ্রহণের উপযুক্ত জায়গা (ঘর) চাই, ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধা চাই।] মোটের ওপর দেশের ৮০% স্কুল ছাত্র-ছাত্রী এই ধরনের স্কুলে পড়ে। ইতিমধ্যে বহু অনুসন্ধান রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে যাতে বলা হচ্ছে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী এই অংশের শিশুদের বিরাট অংশ স্কুলের আওতার বাইরে চলে গিয়েছে। ইঁট ভাটায় - চায়ের দোকানে-ভাতের হোটেলে

বা ক্ষেতের কাজে স্থায়ীভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করছে অথবা নেহাতই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামান্য যা শিখেছিল ভুলে গেছে পুরোটাই। বালিকা-কিশোরীদের অবস্থা আরো সঙ্গীন। বাল্যবিবাহ থেকে পাচার – প্রধান লক্ষ্যবস্তু এরাই। এই অংশের অভিভাবকদেরই কাজ চলে গিয়েছে, মাইনে কমে গিয়েছে, টিঁকে থাকতে পেশা বদলাতে হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অংশ চাইছেন স্কুল খুলে যাক অবিলম্বে। দিনের কয়েক ঘন্টা নিরাপদে স্কুলে থাকবে। একবেলা মিড-ডে মিল পাবে। কিছু শিখবে। নিভৃত-আরামপ্রদ গৃহকোণ আর চব্বিশ ঘন্টা সন্তানদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর দেবার সামর্থ্য এঁদের কোনদিন-ই ছিল না। তাই করোনাতেও এঁরা অকুতোভয় হতে বাধ্য।

তাহলে প্রশ্ন হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র এবং তার প্রতিনিধি সরকার কোন্ দিকে অবস্থান নেবে? সাধারণ যুক্তি বিজ্ঞান বলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের মৌলিক চাহিদাকে মান্যতা দিয়েই প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তরের স্কুল সম্ভবমতো সুরক্ষা বিধি মেনে খুলে দেওয়া উচিৎ। সম্ভবমতো সুরক্ষা বিধি বস্তুগত অবস্থা অনুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তৈরি করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিৎ। ৫০% উপস্থিতি বা অন্যকোন পন্থা বিচার করা যায়। সুরক্ষা বিধি কখনো একশো শতাংশ নিশ্ছিদ্র হতে পারে না। টিকাকরণের সুরক্ষা ভেঙেও সংক্রমণ হচ্ছে এটা তার প্রমাণ। রাস্তায় বার হলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তার জন্য কেউ ঘরে বসে থাকার নিদান দেয় না। বিজ্ঞানসম্মত ট্রাফিক বিধি তৈরি করে। (তা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটে)। বর্তমান অবস্থায় বেসরকারী স্কুলগুলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিভাবকদের মতামত যাচাই করে স্কুল খোলা বা বন্ধ রাখার সংস্থানও দেওয়া যায়।

কিন্তু ঘটনা হল সরকার বিশ্বমহামারির শুরু থেকে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। কোটি কোটি শ্রমিকের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা না করে লক ডাউন করেছে। ফ্যাক্টরী মালিক-পুঁজিপতিদের জন্য আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে (যার সুবিধা পেয়েছে মুষ্টিমেয় অতিবৃহৎরা) কিন্তু শ্রমিক ছাঁটাই না করার শর্ত দেয়নি। তালি-থালি-প্রদীপ আর ভোট-কুম্ভমেলা-খেলা পরিচালনা করেছে কিন্তু হাসপাতালের শয্যা-ভেন্টিলেটর-অক্সিজেন এ মনোযোগ দেয়নি। মার্চ ২০২১ এ সংক্রমণের বারুদস্তুপে বসে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ উপেক্ষা করে ঘোষণা করেছে ভারত থেকে করোনা বিদায়ের পথে ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই নিয়মই লাগু হচ্ছে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত-হতবুদ্ধি অবস্থার চরম নিদর্শন হল মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বোর্ড পরীক্ষা পরিচালনা। 'স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে কিন্তু শিক্ষাবর্ষ ঠিক থাকবে' – এই নীতির ওপর দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ বোর্ড পরীক্ষার্থী ছাত্র সমাজকে নিয়ে ছেলেখেলা ছাড়া কিছু করা হয়নি।

শেষে আসে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণাগার ইত্যাদি উচ্চ শিক্ষা সংস্থানসমূহ। এই অঙ্গনে কেউ নাবালক-নাবালিকা নয়। এঁদের ভোটের লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে 'দেশের-রাজ্যের' শাসক বাছাই করার জন্য কিন্তু সুরক্ষা বিধি মেনে ক্লাস করতে চায় কিনা তেমন মতামত নেবার কথা সরকারীতন্ত্রের বিবেচনাতেও আসে না। এই দুবছরে কত লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চশিক্ষার কফিনে পেরেক পোঁতা হল সেটাই গবেষণার বিষয় হওয়া উচিৎ। কেবল ব্যক্তিগত ক্ষতির বিষয় নয়। কৃষি থেকে শিল্প, রকেট বিজ্ঞান থেকে টিকা, আবহারওয়ার পূর্বাভাস থেকে আধুনিক ফ্লাইওভার – উচ্চ শিক্ষা বিনা গতি নেই। তবু তালা খোলে না।

পরিবার থেকে রাষ্ট্র প্রতিটা সংস্থাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্তব্যকর্ম নির্দিষ্ট করে। মহামারির তীব্রতম পর্যায়েও হাসপাতাল-দমকল-কৃষিকাজ-শিল্পোৎপাদন কেউ বন্ধ রাখার দাবিও তোলেনি। লক ডাউনের পর যখন আনলক হতে শুরু করল তখন শপিং মল-সিনেমা হল-বিনোদন পার্ক-মদের দোকান-ভ্রমণকেন্দ্র-মঠ-মন্দির আগে পরে খোলা হতে শুরু করল। এর সাথে সাথে দেশ-দুনিয়াজুড়ে ফুটবল-ক্রিকেট-অলিম্পিক, কার্ফু শিথিল করে বা তুলে নিয়ে ওনম-বকরিঈদ-জন্মাষ্টমী, মাটি উৎসব থেকে খেলা হবে। দুয়ারে সরকার আর লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য লাইনে দাঁড় করানো। কিন্তু লোকাল ট্রেন চলবে না আর অঙ্গনওয়াড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণাগার – কোনওভাবেই খোলা যাবে না! সুতরাং গণশিক্ষা ব্যবস্থা (আর সস্তার গণপরিবহন ব্যবস্থা) রাষ্ট্র তথা সরকারের অগ্রাধিকারে যে নেই এটা বোঝার জন্য কোনমাত্র বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না। এর সাথে যুক্ত হয়েছে এই সুযোগে শিক্ষাকে (অন্ততঃ তার বড় একটা অংশকে) অনলাইন মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করার জোরদার প্রচেষ্টা। শিক্ষার খন্ডিতকরণ-বাণিজ্যকরণ থেকে নতুন প্রজন্মকে বিচ্ছিন্নকরণ সরকারের এই সমস্ত অগ্রাধিকারকে বাস্তবায়িত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা যতটা সম্ভব দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে।

অতএব শিক্ষা যাদের কাছে অগ্রাধিকার – সেই সাধারণ অভিভাবক-ছাত্র-ছাত্রী, গণতান্ত্রিক শিক্ষক সমাজের কাঁধে জনবিরোধী সভ্যতাবিরোধী 'শিক্ষা বন্ধ' এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ওঠা আওয়াজকে গগনভেদী করে তোলার দায়িত্ব বর্তায়।■

বিশেষ নিবন্ধ ঃ

ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবন

বছর বছর ত্রাণের জন্য হাত পাতা নয়, পরিত্রাণ চাই!

গত ২৬শে মে ২০২১ অতীতের মত আবহবিজ্ঞানীদের পূর্বাভাস স্থান ও কালের হিসেবে শতকরা ৯৯ শতাংশ মিলিয়ে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস ওড়িশার উপকূলে আছড়ে পড়ে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলসহ সংলগ্ন অঞ্চলে ভয়াবহ ক্ষতি করল। পশ্চিমবঙ্গ এবং পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে যত না ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে ক্ষতি হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে ঐদিন প্রায় একই সময় বড় জোয়ার (ভরা কটাল) থাকায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, ৩ লক্ষাধিক ঘর ভেঙেছে এবং ঘূর্ণিঝড়, প্লাবন, বর্জ্রপাত, প্রায় একই সময় হওয়া টর্নেডো সব মিলিয়ে সারাদেশে মাত্র ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর চলেছে সরকারি ত্রাণ বন্টন নিয়ে দুর্নীতি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির দ্বারা ত্রাণ বন্টন। কোমর জলে থালাবাটি হাতে ত্রাণের লাইনে দাঁড়ানো মানুষের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খেয়েছে। এর কি কোন স্থায়ী সমাধান নেই? সুন্দরবনের কোণে কোণে আওয়াজ উঠেছে **ত্রাণ নয় পরিত্রাণ চাই, ভিক্ষা নয় স্থায়ী সমাধান চাই, রিলিফ চাই না পাকা বাঁধ চাই!**

স্থায়ী সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে গেলে আমাদের ইতিহাসের আলোকে বৈজ্ঞানিক সমাধানে পৌঁছাতে হবে।

ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাতের মতই ঘূর্ণিঝড় এবং তদ্‌জনিত সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ও প্লাবন হল প্রাকৃতিক ঘটনা যা এই পৃথিবীতে মানব সমাজের সূচনাকালের বহু কোটি বছর আগে থেকেই চলছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। এই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি মানবজীবনে দুর্যোগ ডেকে আনে বলে এগুলিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগও বলা হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যে ঘটা এই ঘটনাগুলি পৃথিবীর সজীবতার, পরিবর্তনশীলতার প্রতীক। মানব সমাজ তার সূচনাকাল থেকেই এগুলির সাক্ষী, কিন্তু এর কারণ জানা না থাকায় এগুলিকে ভয়ের চোখে দেখে এসেছে এবং মহাকাশে দৃশ্যমান জগৎ বা স্বর্গলোকের অলৌকিক শক্তিই এর নিয়ন্তা বলে বিবেচনা করেছে। প্রকৃতির কাছে অসহায় দাসত্ব করে, রুষ্ট দেবতা বা ঈশ্বরের প্রকোপ থেকে বাঁচতে তাঁকে তুষ্ট করার নানাবিধ প্রয়াস নিয়েছে পূজার্চনা, নিত্যগীতি, যজ্ঞের মাধ্যমে। কিন্তু সমগ্র মানব সমাজ, সমাজের গোষ্ঠীপতিদের দ্বারা প্রোথিত এই অলৌকিক ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকেনি। শুরু হয়েছে প্রকৃতিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার আত্মরক্ষার সংগ্রাম। এই আত্মরক্ষার সংগ্রাম থেকেই প্রকৃতির নিয়ম বা বিজ্ঞান জানার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পৃথিবীতে মানবজাতি যতদিন থাকবে ততদিন এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। শ্রেণীতে বিভক্ত মানব সমাজ এই মহাসংগ্রামে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার পথে বড় বাধা। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে শাসক মালিকশ্রেণী ততটুকুই প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে অগ্রসর হয় যতটুকুতে তার মূল লক্ষ্য মুনাফা এবং অতিমুনাফা বজায় থাকে অন্যথায় বাধা সৃষ্টি করে। যেদিন মানব সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের অবসান হয়ে সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে সেদিন থেকেই মানবজাতি পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে এই মহাসংগ্রামে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে পারবে।

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় এবং প্লাবনের পর সুন্দরবনসহ সমগ্র উপকূলবাসীর মধ্য থেকে যে স্থায়ী সমাধানের দাবি উঠেছে তার যথার্থতা বিচার করতে হলে প্রথমে আমাদের ঘূর্ণিঝড়ের বিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অভিমত জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ঘূর্ণিঝড়ের বিজ্ঞান ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে সমুদ্রে নানা প্রকার ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ায় নিরক্ষীয় জলবায়ুর প্রভাবে ঘূর্ণিঝড় হয় এবং **এগুলিকে নিরক্ষীয় ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন (Tropical Cyclone) বলে।** নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় নিরক্ষরেখার বা বিষুবরেখার (Equatorial Line) ৫° উত্তর থেকে ৫° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে, বিশেষত ইন্টার ট্রপিক্যাল কনভারজেন্স জোন (Inter Tropical Convergence Zone) এ যেখানে দুই গোর্লাধের বায়ুপ্রবাহ একটি জায়গায় মিলিত হয়। গভীর সাগরে এই স্থান সুনির্দিষ্ট নয়, জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সূচনাবিন্দুর পরিবর্তন হয়। তবে দীর্ঘ গবেষণায় জানা গেছে যে বঙ্গোপসাগরের দিকে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি অঞ্চলে হয়। ভূতাত্ত্বিকভাবে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হলো ভারত মহাসাগরের অভ্যন্তরে দুটি পরস্পর অভিমুখী প্লেট সীমান্ত বরাবর সৃষ্টি হওয়া অগ্নুৎপাতজাত দ্বীপরাশি Volcanic Island Arc)। ফলে এই অঞ্চলে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে তাপের প্রবাহ (Heat Flow) অন্য অঞ্চল থেকে একটু বেশি। তবে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তির এটা একটি কারণ কিনা তা এখনও গবেষণায় জানা যায় নি।

আবহবিজ্ঞানের ভাষায় সাইক্লোন হল একটি বদ্ধ চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান তরলের (ফ্লুইড) গতি। এই সর্পিল জলীয় বাতাস পৃথিবীর নিজ অক্ষ বরাবর ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণায়মান হয়। সমুদ্রের জল ২৭° সেলসিয়াসের বেশি গরম হয়ে উঠলে বাষ্পায়ণের ফলে সমুদ্রের উপরিতল থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প নির্গত হয় কিন্তু জলরাশির নিচের দিকের তাপমাত্রা তুলনায় কম থাকে। এই বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প প্রচুর পরিমাণে লীনতাপ সংগ্রহ করে এবং স্থানিকভাবে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তখন নিরক্ষরেখার দুইদিক থেকে তুলনায় ঠান্ডা ও ভারি বায়ু এই নিম্নচাপীয় অঞ্চলে ছুটে আসে। উপরের দিকে হাল্কা গরম বায়ু এবং নিচের দিকে ভারি ও ঠান্ডা বায়ুর মধ্যে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয় পৃথিবীর ঘূর্ণনজনিত কোরিওলিস বলের প্রভাবে। সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় ঠিক নিরক্ষরেখা বরাবর সৃষ্টি না হয়ে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখার সামান্য উত্তরে (৫° উত্তর অক্ষাংশ অবধি) সৃষ্টি হয়ে তা উত্তর গোলার্ধে আর নিরক্ষরেখার সামান্য দক্ষিণে (৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ অবধি) সৃষ্টি হয়ে দক্ষিণ গোলার্ধে ধেয়ে যায় যেখানে তারা যথাযথ ঘূর্ণন তৈরি করতে পারে। বায়ুমন্ডলে যতরকম প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে তার মধ্যে সাইক্লোনই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং মানবজীবনে তা বড় দুর্যোগ ডেকে আনে। ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোনকে গতিবেগের নিরীখে ৭ ভাগে ভাগ করা যায় । (টেবিল দ্রষ্টব্য)

ঘূর্ণিঝড়ের আকৃতি ও প্রকৃতি ঃ একটি সাইক্লোনের ব্যাস ৩০০-৬০০ কি. মি অবধি হতে পারে। মারাত্মক সাইক্লোনিক ঝড় বলা হয় যখন তার গতিবেগ ঘন্টার ১১৮ কি. মি-র অধিক হয়। যেখানে বায়ুপ্রবাহ হয় কেন্দ্রের দিকে এবং বায়ুর চাপ হয় সর্বনিম্ন (৫০-৬০ হেক্সা পাস্কেল)। সাইক্লোনের সাথে ঝড়ের উচ্ছাস (Storm surge) যুক্ত হয়। ঝোড়ো বাতাস বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে এবং তার সাথে লীনতাপ যা সাইক্লোনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়। ঘূর্ণায়মান বাতাস কেন্দ্রের দিকে সমাপতিত হয় যেখানে বায়ুর চাপ সর্বনিম্ন এবং গতি অতিপ্রবল।

স্যাটেলাইট চিত্রে সাইক্লোনের সবচেয়ে চোখে পড়ার মত দিক হল তার **চোখ** (eye)। এই চোখ হল ক্ষুদ্র (৮-১০ কি. মি ব্যাস) এবং প্রায় গোলাকৃতির (চিত্র-১)। এই চোখ হল সবথেকে উষ্ণ অঞ্চল। সাইক্লোনের চোখ যত বেশি উষ্ণ হয় সাইক্লোনের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা তত বেশি হয়। এই চোখের কাছে বাতাসের গতিবেগ সবথেকে কম, ২৫-৩০ কি. মি/ঘন্টা এবং এখানে কার্যত কোন বৃষ্টিপাত হয় না এবং কেন্দ্রীয় চোখের ঠিক বাইরের পরিধি অঞ্চলে বায়ুর গতিবেগ সর্বাধিক এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও সর্বাধিক। বায়ুর গতিবেগ কমতে থাকে যত সর্বাধিক গতিবেগের উৎস থেকে দূরে যাওয়া যায়। প্রধান সাইক্লোনের ব্যাস ১০০-৮০০ কি. মি অবধি হয়। এখানে সাইক্লোনের সাথে অনেক সময় একটি **লেজ** (tail) থাকে অনেকগুলি ব্যাস নিয়ে। সমগ্র সাইক্লোন একটি সর্পিল আকারের এবং **'কমা'** (comma) আকৃতির হয়। এই লেজ কয়েকশত কি. মি অবধি লম্বা হতে পারে। লেজ সাইক্লোনের প্রধান কেন্দ্র মহাদেশে প্রবেশ করার অনেক আগেই প্রবেশ করে এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে। এই কারণে সাইক্লোন মহাদেশে ঢোকার অনেক আগেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে বৃষ্টিপাতের সূচনা করতে পারে। একটি সাইক্লোনের জন্ম থেকে বিলয় ঘটার সময়কাল ৭-১০ দিন এবং এর প্রভাবে ২৫-৫০ সে. মি অবধি বৃষ্টিপাত হতে পারে। মহাদেশে প্রবেশের সাথে সাথেই সাইক্লোনের লয় শুরু হয় কারণ তখন থেকেই সে জলীয় বাষ্পের উৎস হারায়।

ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণীবিভাগ

	গতিবেগ
লো প্রেসার এরিয়া (নিম্নচাপ)	৩১ কি.মি/ঘন্টার কম
ডিপ্রেসন (গভীর নিম্নচাপ)	৩১-৪৯ কি.মি/ঘন্টা
ডিপ ডিপ্রেসন (অতিগভীর নিম্নচাপ)	৫০-৬১ কি.মি/ঘন্টা
সাইক্লোনিক স্টরম (ঘূর্ণিঝড়)	৬২-৮৮ কি.মি/ঘন্টা
সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টরম (মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়)	৮৯-১১৮ কি.মি/ঘন্টা
ভেরি সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টরম (খুব মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়)	১১৯-২২১ কি.মি/ঘন্টা
সুপার সাইক্লোন	২২২ কি.মি/ঘন্টার বেশি

আগেই বলা হয়েছে যে উত্তর গোলার্ধে সাইক্লোন ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে। তবে একটি চলমান সাইক্লোনের ডান দিকের ধ্বংসাত্মক

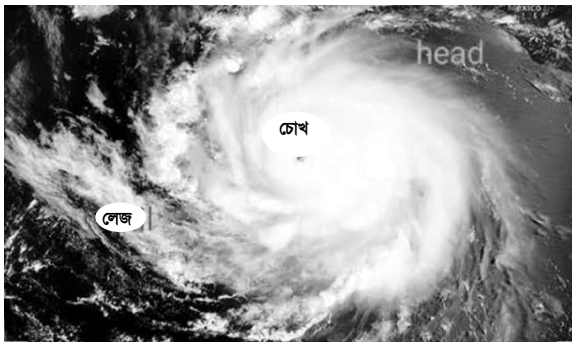

চিত্র-১ ঃ ট্রপিক্যাল সাইক্লোন

ক্ষমতা বাম দিকের তুলনায় সবসময় বেশি। বঙ্গোপসাগরের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থা ও ফানেল আকৃতির (পূর্বঘাট পর্বতমালা ও আরাকান পর্বতমালার মধ্যবর্তী) জন্য এখানে সাইক্লোন শুরুতে উত্তরপশ্চিমমুখী থাকলেও পরে পূব দিকে ঘুরে যায় (চিত্র-২)। যদিও ঘূর্ণিঝড়ের এই প্যাটার্ন সবসময় মেলে না, অধিকাংশ সময় সাইক্লোনের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং সমুদ্রের জলোচ্ছাস (১২ মিটার অবধি) দেখা যায়। সাইক্লোন মহাদেশে আছড়ে পড়ার সময়কালে সমুদ্রে বড় জোয়ার (অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় ভৌগোলিক কারণে) বা সুনামি (প্রধানত ভূকম্পজনিত কারণে) দেখা দিলে জলোচ্ছাস আরও বড় মাত্রায় হয়। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে সুনামির সাথে ঘূর্ণিঝড়ের সমাপতন রেকর্ড উচ্চতায় জলোচ্ছাস হুগলী-নদীয়া জেলা অবধি প্লাবন ঘটিয়েছিল তৎকালীন কলকাতাসহ। এবছর ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ের সময় ভরা কটাল (বড় জোয়ার) পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে প্রবল জলোচ্ছাস সৃষ্টি করে ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছে। গবেষণায় এটাও জানা গেছে যে নিরক্ষীয় অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় প্রধানত বর্ষার আগে (এপ্রিল-মে) এবং বর্ষার পর (অক্টোবর-নভেম্বর) বেশি সংখ্যায় হয়। গত ১০ বছরে ভারতের আরব সাগরের ৬টি এবং বঙ্গোপসাগরে ৫টি বড় ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। ১৯৮১-৮৪ সময়কালে ছোট-মাঝারি-বড় মিলিয়ে বঙ্গোপসাগরে সর্বাধিক ১৭৪টি ঘূর্ণিঝড় দেখা গেছে।

ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা কি বাড়ছে?

১৮৫০-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ সময়কালের ঘূর্ণিঝড়ের হিসাব (চিত্র-৩) থেকে বোঝা যায় যে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা সময়ের সাথে সাথে শুধু বাড়ে নি, কখনও কমেছে। তবে তথ্য বলছে সাম্প্রতিককালে ১৯৮০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়কাল থেকে এর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এ বিষয় বিজ্ঞানীমহল সহমত যে

চিত্র-২ ঃ বঙ্গোপসাগরের বিশেষ অবস্থান

ট্রপিক্যাল সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় এর প্রধান কারণ নিরক্ষীয় অঞ্চলের বায়ুমন্ডল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের উষ্ণতাবৃদ্ধি। বিজ্ঞান এটাও বলে যে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা সময় অন্তর এবং মূলত মহাজাগতিক কারণে (প্রধানত সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্ব এবং অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে বাড়ে এবং কমে) (চিত্র-৪)। বিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশ এই সাইক্লোনের (সব ধরনের) সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে মনুষ্যজনিত উষ্ণায়ণ (বিশেষত কার্বন নির্গমনের মাত্রাবৃদ্ধিকে)কে দায়ী করেছেন। চীনা ও ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা বলেছেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৭° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাই ঘূর্ণিঝড়ও বাড়ছে। প্রশ্ন ওঠে ১৯৫০ এর দশকে এবং ১৯৭০ এর দশকে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা তবে কমার কারণ কী? এর কোন স্পষ্ট জবাব মেলেনি। সুতরাং এই সূত্রায়ণকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না। কিন্তু এটা তথ্য থেকে স্পষ্ট যে সময় অন্তরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা কমলেও ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ (অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর) এরপর থেকে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা সবমিলিয়ে বেড়েছে। এখন প্রশ্ন হল এর কোন বিশেষ কারণ আছে কী?

আমরা জানি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পরমাণু বোমা পরীক্ষা করে এবং সেই বছরের ৬ই এবং ৯ই অগাস্ট জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি দ্বীপে তা নিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। এরপর থেকে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া), ফ্রান্স, ইংলন্ড, চীন, বেলজিয়াম শুধু নয়

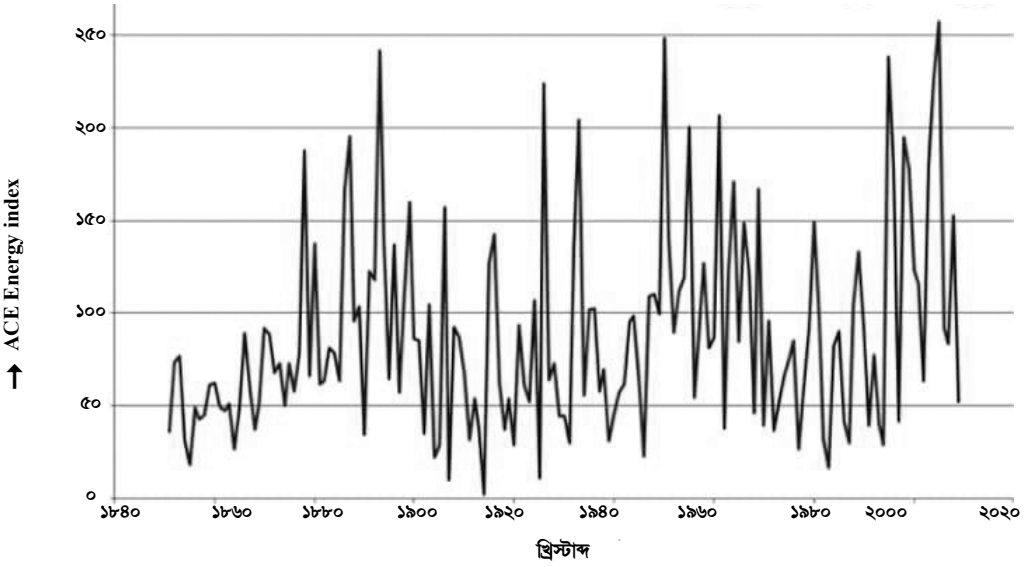

চিত্র ৩. ১৮৫০ থেকে ২০১৫ সময়কালের ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের হিসাব

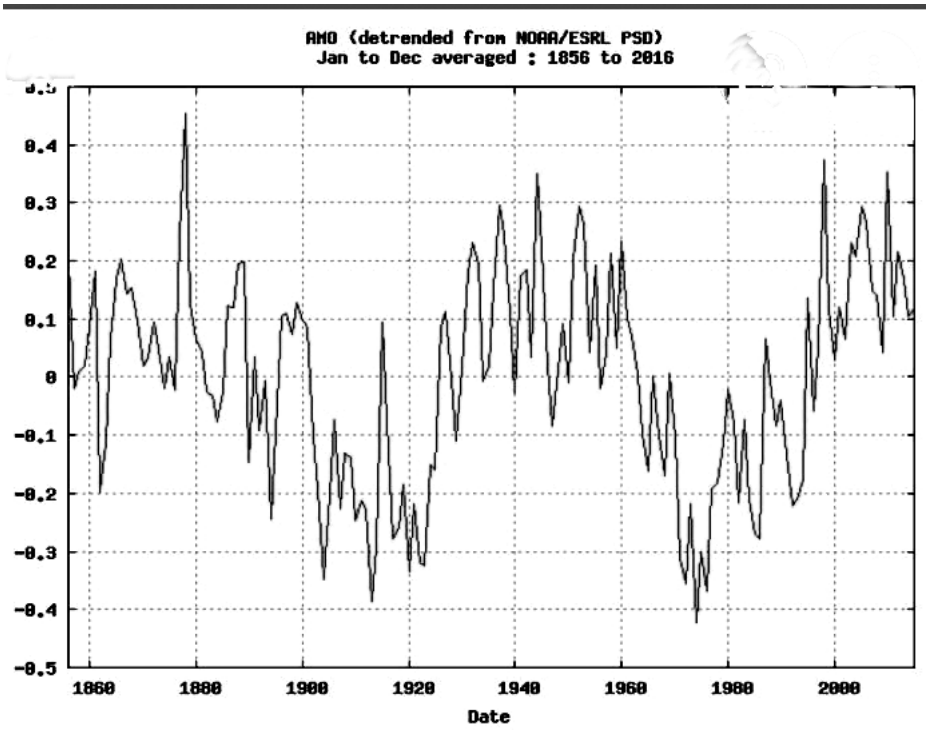

চিত্র ৪. ১৮৬০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার তারতম্যের রেকর্ড।

ভারত, পাকিস্তান, ইরান, উত্তর কোরিয়া সহ বিভিন্ন দেশ প্রকাশ্য ও গোপনে পরমাণু গবেষণা, শক্তি উৎপাদন ও বোমা তৈরির কাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করছে। উৎপাদনের পর এই পারমাণবিক বর্জ্য নিঃক্ষেপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তিনটি, যথাক্রমে – (১) মোটা সীসার পাত্র (ক্যাপসুল)এ বর্জ্য ভর্তি করে সমুদ্রের গভীরে গর্ত খুঁড়ে নিঃক্ষেপ। (২) এই সীসার ক্যাপসুল পরস্পর অভিমুখী প্লেট সীমান্তে গর্ত খুঁড়ে নিঃক্ষেপ করা যাতে ঐ ক্যাপসুল সময়ের সাথে সাথে গুরুমন্ডলে চলে যায় যেখানে এই শক্তির প্রাকৃতিক ভান্ডার আছে। (৩) ঐ সীসার ক্যাপসুল রকেটে করে মহাশূন্যে নিঃক্ষেপ।

কিন্তু আইএইএ-র সহযোগী রেডিও অ্যাক্টিভ কমিশন (OSPAR) ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ২০-২৩শে এপ্রিল এক কনভেনশন রিপোর্টে জানায় যে রেডিও অ্যাক্টিভ (বা তেজস্ক্রিয়) বর্জ্য পদার্থ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করা হচ্ছে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এর মাত্রা ছিল ০.০২ পি বি কিউ (সামান্য) এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এর মাত্রা বেড়ে হয়েছে ৭ পি বি কিউ (প্রচুর)। বিশ্বের ৮টি দেশ উত্তর পূর্ব আটলান্টিক সাগরে ৯৩.৫% পারমাণবিক বর্জ্য সমুদ্রে ফেলেছে নিয়ম লঙ্ঘন করে। এই দেশগুলি হল বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ইউ কে, ইউএসএ। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) ফেলেছে আর্টিক সাগরে। প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলেছে জাপান, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া এবং ইউএসএ। বেসরকারিসূত্রে জানা যায় যে ভারত মহাসাগরের দিয়াগো গার্সিয়া অঞ্চলে অনুরূপভাবে পারমাণবিক বর্জ্য ফেলছে ইউএসএ এবং তার সহযোগীরা। ভারতও এই তালিকায় রয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগরে চীন।

এইভাবে প্রতিনিয়ত যে বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক বর্জ্য গভীর সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে তা থেকে অবিরত নির্গত হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি। এই বিকিরণ যেমন সমুদ্রের জীবজগতের বিনাশে ভূমিকা রাখছে, বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করছে তেমনই সমুদ্রের গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। চীনা বিজ্ঞানী ফেমিং হাং, জি লিন এবং বিনসিন সেং (২রা ডিসেম্বর ২০১৯) তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন যে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বর্জ্য শুধুমাত্র সমুদ্রের গড় তাপমাত্রা বাড়ায় না, সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা সমুদ্রতল থেকে নিচের দিকে ফারাক ঘটায় (২.৭৯° সেলসিয়াস থেকে ৪.২৫° সেলসিয়াস)। এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে কম বিকিরণ করে এমন বর্জ্য (লো লেভেল ওয়েস্ট) থেকে। স্বভাবতই বোঝা যায় হাই লেভেল ওয়েস্ট থেকে উষ্ণতাবৃদ্ধি কেমন হয়। যদিও হাই লেভেল ওয়েস্ট এআইইএ-র নির্দেশমত যত্রতত্র নিক্ষেপ করা বেআইনী। কিন্তু আইনের রক্ষক যেখানে ভক্ষক সেখানে কি ঘটতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

ঘূর্ণিঝড়কে কি উৎস থেকে অকার্যকরী করা সম্ভব?

আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় প্রধানত প্রাকৃতিক কারণে (মনুষ্যজনিত কারণে এর প্রাবল্য ও সংখ্যা বাড়তে পারে মাত্র) সৃষ্ট। সুদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা হয়ত একে উৎসস্থলে দুর্বল করতে সক্ষম হবেন। আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে ভয়ঙ্কর সাইক্লোন কয়েক হাজার পারমাণবিক বোমার সমান শক্তি ধারণ করে ধ্বংসলীলা চালায়। তাই একে উৎসস্থলে নিষ্ক্রিয় করার মত প্রযুক্তি এখনও প্রয়োগ করার স্তরে পৌঁছায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলক স্তরে আটলান্টিক সাগরে সমুদ্রের গভীরে গিয়ে আকাশ থেকে সিলভার আয়োডাইড নিক্ষেপ করে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ কমানোর প্রয়াস নিয়েছে। পরীক্ষামূলক স্তরে ভাল ফল মিললেও এই প্রযুক্তি এখনও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগের স্তরে পৌঁছায়নি। অন্য প্রযুক্তি হল ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তিস্থলে অর্থাৎ সমুদ্রজলে তেল বা তৈলজাতীয় রাসায়নিক ঢেলে দেওয়া, যাতে বাষ্পায়নের হার কমে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ বিজ্ঞানসম্মত হলেও তা পরিবেশে বড় ক্ষতি সৃষ্টি করতে পারে বলে এখনও প্রয়োগ হয়নি।

তবে সমস্যার স্থায়ী সমাধান কি?

সুতরাং আধুনিক স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সাহায্যে বর্তমানের মত নিখুঁত পূর্বাভাসই এই দুর্যোগের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে পারে। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই তা করে দেখিয়েছেন। কিন্তু মানুষের বাসস্থান, জীবিকা ও সম্পত্তি এতে রক্ষা হয় না। এর জন্য চাই সুসংগত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। সুন্দরবন সহ সমগ্র উপকূলবাসীর দাবি এটাই। তাঁরা ত্রাণ চান না, সমস্যা থেকে স্থায়ী পরিত্রাণ চান। সাধারণ মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে পরিত্রাণের পথও আবিস্কার করে রাষ্ট্রের কাছে দাবি রেখেছেন। কিন্তু জনসাধারণের এই দাবি রাষ্ট্র কর্ণপাত করছে এমন কোন তথ্য কারও জানা নাই। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে সুন্দরবনের নদীর পাড়গুলি (embankment) উঁচু এবং কংক্রিটের পাকা করা সম্ভব নয়। এই দাবি নাকি বিজ্ঞান বিরোধী, পরিবেশ আইন বিরোধী এবং বিরাট ব্যয়বহুল। অতএব এই দাবি মানা যাবে না। নদীর পাড়ে সুন্দরী গাছ (ম্যানগ্রোভ) লাগালেই চলবে। রাষ্ট্রের পক্ষ নিয়ে নানান পরিবেশবাদীরা জনগণের দাবিকে নস্যাৎ করে পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করছেন। এই রচনাগুলির মধ্যে সুন্দরবনসহ উপকূল অঞ্চলে মানুষের বসতি স্থাপনের বিরোধিতা করা হয়েছে। বলা হয়েছে

উপকূল অঞ্চলে নদী বার বার গতিপথ পরিবর্তন করে, বাঁধ দিয়ে (পাড় বাঁধিয়ে) নদীকে বেঁধে রাখতে চাইলে বিপদ আরও বাড়বে। সুন্দরী গাছ লাগানো ছাড়া অন্য কিছুই করা চলবে না। মানুষের বসতিস্থাপন এবং সভ্যতা বিকাশকেই তারা দুর্যোগের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন।

পরিবেশবাদীদের এই যুক্তিগুলি বকলমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের যুক্তি। এই যুক্তি প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানবজাতির সংগ্রামে বাধাস্বরূপ। প্রতিবাদী ও আন্দোলনরত জনতার কণ্ঠে তাই সঠিক বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রয়োজন। **প্রথমতঃ** ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র সুন্দরবন, মেদিনীপুরের উপকূল কার্যত জঙ্গল ছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। মানুষের কোন বসতি তখনও সুন্দরবনে গড়ে ওঠেনি এবং ম্যানগ্রোভ ছিল আজকের তুলনায় অন্তত ১০ গুণ বিস্তৃত। তাহলে ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবন সমগ্র উপকূল, সদ্য গড়ে ওঠা কলকাতা শহর ভাসিয়ে হুগলী-নদীয়া অবধি প্লাবন ঘটেছিল কেন? তখন তো সুন্দরবনের কোন নদীর পাড় বাঁধানোই হয়নি? **দ্বিতীয়তঃ** নদী তার গতিপথ নিয়ত পরিবর্তন করে ভূমির ঢালের পযায়ক্রমিক পরিবর্তনের জন্য। তাহলে সমগ্র বিশ্ব এবং ভারতের প্রধান শহরগুলি (যা প্রধানত নদীর পাড়ে বা সমুদ্রের পাড়ে অবস্থিত) কে ভেঙে ফেলতে হবে, না নদীর প্লাবন থেকে শহরগুলিকে রক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবস্থা গড়তে হবে? **তৃতীয়তঃ** নেদারল্যান্ড-এ এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সমুদ্রতলের চেয়ে নিচু এলাকাকে সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে রক্ষা করা, সেখানে কৃষিকাজ, শিল্প ও নগর গঠন কি অবৈজ্ঞানিক? **চতুর্থতঃ** আইনের জন্য মানুষ না মানুষের জন্য আইন?

যাই হোক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পক্ষধররা তাদের কথাই বলবে। জনগণকে স্থির করতে হবে স্থায়ী সমাধানের জন্য করণীয় কি?

স্থায়ী সমাধানের জন্য করণীয় কি?

(১) সকলের জন্য সরকারি খরচে, মজবুত, দুর্যোগ প্রতিরোধক পাকা ছাদওয়ালা বাড়ি অবিলম্বে গড়ে দিতে হবে। দুর্যোগ প্রতিরোধের নামে ত্রাণের টাকা নয়ছয় না করে অবিলম্বে এই কাজ করতে হবে।

(২) উপকূল অঞ্চলের নদীর পাড়গুলি সুমন্বিত পরিকল্পনা অনুসারে পুনর্নির্মাণ, উপকূল অঞ্চলে জোয়ার-ভাটা চলা নদীগুলির পাড়ে যেমন সুন্দরী গাছের সারি দিয়ে ঘিরতে হবে। তার অন্তত ৩ মিটার পরে ১০-১২ ফুটের মাটির বাঁধ শক্তভাবে গড়তে হবে এবং তার দৃঢ়তা প্রদানের জন্য ঝড় প্রতিরোধক গাছের সারি লাগাতে হবে। এই মাটির বাঁধের ২-৩ মিটার পর নদীর দুইপাড়ের কংক্রিটের পাকা এবং অন্তত ১৫ ফুট উঁচু বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। এই পরিকল্পনায় নদীর পাড় (চালু কথায় নদীবাঁধ) গড়লে নদীর গতিপথ ভূ-প্রাকৃতিক কারণে পরিবর্তন হলেও নদীর পাড় ঝড়, জলোচ্ছাস রুখে দেবে এবং স্থায়ীভাবে প্লাবনের হাত থেকে গ্রামগুলি রক্ষা পাবে। নিয়মিত এই বাঁধগুলির মেরামতি এবং নদীর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য পলি উত্তোলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও রাখতে হবে বিজ্ঞানীদের পরামর্শমত।

(৩) উপকূল অঞ্চলের এবং দেশের সর্বত্র মাটির তলা দিয়ে বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করা দরকার। এতে সাইক্লোন বা অন্য কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া বন্ধ হবে। বিদ্যুতের তার, খুঁটি উপড়ে অর্থব্যয়, জীবনহানি এবং বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা রোধ করা যাবে। কলকাতার মত বড় শহরে এটা করা সম্ভব হলে অন্যত্র তা কেন সম্ভব নয়?

(৪) অবিলম্বে রাস্তার ধারে বিদ্যুতের খুঁটির পাশে, ঘরবাড়ি-দোকানের সারির পাশে অবৈজ্ঞানিক বৃক্ষরোপণ বন্ধ করে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুসারে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। এতে ঝড়ে গাছ উপড়ে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির অনাবশ্যক হানি বন্ধ হবে।

(৫) উপকূল অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনা করে রাস্তাঘাটের পুনর্নির্মাণ করতে হবে।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সুন্দরবনসহ উপকূল অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা-সম্পত্তিহানিকে প্রায় ৯৯ শতাংশ প্রতিরোধ করা সম্ভব। অর্থাৎ বছর বছর দুর্যোগে সর্বস্ব হারানোর হাত থেকে মানুষ বাঁচতে পারে। সুন্দরবন সহ উপকূলবাসী মানুষের ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার স্থায়ী সমাধান এটাই।

(৬) নদীর পাড় (নদী বাঁধ) পুনর্নির্মাণ করতে হলে দুই পাড়ে সব মিলিয়ে অন্তত ১০০ মিটার জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে তিন ধাপে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। তাই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ঘর, জমি, পুকুর, দোকান সবকিছু বর্তমান বাজারদরের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাঁদের অন্যত্র পুনর্বাসন দিতে হবে।

কিন্তু এই সমাধানের পথ রাষ্ট্র এবং তার পরিচালকদের অজানা নয়। এই মরণাসন্ন যুগে পুঁজিবাদ স্থায়ী সমাধানে অপারগ। স্থায়ী সমাধান নয়, ক্ষতে মলম দিতেই তার লাভ। ধ্বংস হলে পুনর্গঠনের নামে পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ে। শ্রমজীবী জনতাকে তাই প্রকৃতি বিজ্ঞান জানার পাশাপাশি সমাজ বিজ্ঞানকেও বুঝতে হবে। ব্যাপক জনগণের স্বার্থের ব্যবস্থা না গড়তে পারলে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে আশু দাবি আদায়ের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ও পরিকল্পিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়াই বর্তমান সময়ের দাবি। বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ সুন্দরবনসহ সমগ্র উপকূলবাসীর কাছে এই আবেদনই পেশ করছে ■

চয়ন ঃ

"ভারত কী করে ভাইরাস মোকাবিলা করে টিকে থাকবে ? কেবল ভ্যাকসিন দেশকে বাঁচাতে পারে না"

– শাহিদ জামিল

[INSACOG (ইন্ডিয়ান সার্স-কোভ-২ জিনোম সিকোয়েন্সিং কনসর্টিয়াম) ভারত সরকার দ্বারা গঠিত দশটা গবেষণাগারের এক সমন্বিত সংস্থা। ভাইরাসের জিনগত গঠনের প্রকরণ অনুসন্ধান করে অতিমারি মোকাবিলার জন্য সরকারকে বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সংস্থা গঠিত হয় ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। হরিয়ানার সোনেপতস্থিত অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবেদী স্কুল অফ বায়োসায়েন্সের নির্দেশক ভাইরাস বিশেষজ্ঞ শাহিদ জামিল INSACOG গঠিত হওয়ার কিছু পরেই তার বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর চেয়ার (অধ্যক্ষ) পদ গ্রহণ করেন।

কিন্তু ভারত সরকার যে ভাবে বিশ্ব মহামারি মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে বিষয়ে ডঃ জামিল সমালোচনা করেন। **১৩ই মে ২০২১ নিউ ইয়র্ক টাইমস** পত্রিকায় তাঁর এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার কয়েকদিনের মধ্যে তিনি INSACOG থেকে পদত্যাগ করেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধের বাংলা অনুবাদ (সংক্ষেপিত) প্রকাশ করা হল। (সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ বুঝতে সহায়ক হবে এই বিবেচনায়।) স্মরণে রাখা উচিৎ এই নিবন্ধ সেই সময় লেখা যখন ভারতে দৈনিক সংক্রমণ ৪ লাখ পার হয়ে গেছে, মৃত্যু ৪০০০ – সর্বত্র অক্সিজেন, হাসপাতালের শয্যা, ভেন্টিলেটর-এর জন্য হাহাকার। – সম্পাদক, সমীক্ষণ]

মঙ্গলবারের [১১ই মে, ২০২১] হিসেব হল ভারতে ২৩ মিলিয়ন নথিভুক্ত সংক্রমণ ও ২,৫৪,০০০ এর বেশি মৃত্যু। প্রকৃত সংখ্যাটা আরো অনেক বেশি হতে পারে কারণ দেশে গত এক সপ্তাহের বেশি গড়ে দৈনিক ৩,৮০,০০০ নতুন কেস নথিভুক্ত হচ্ছে।

ভাইরাস বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমি গত বছর থেকে রোগের প্রকোপ এবং ভ্যাকসিনের প্রস্তুতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমি ভারত সরকার দ্বারা গত জানুয়ারিতে গঠিত INSACOG-এর বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা গোষ্ঠীর সভাপতিত্ব করছি। রাষ্ট্রীয় গবেষণাগারগুলোর এই গোষ্ঠী জিনগত অনুক্রম বিশ্লেষণ করে ভাইরাসের নতুন রূপভেদ (varient) চিহ্নিত করবে। আমার পর্যবেক্ষণ হল অধিক সংক্রামক রূপভেদ ছড়িয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যৎ ঢেউ প্রশমিত করতে গেলে ভারতকে এখনকার দৈনিক ২ মিলিয়ন ডোজ এর থেকে অনেক বেশি টিকাকরণ করতে হবে। ভারতে নববর্ষের আশেপাশে এই ভাইরাসের প্রকরণ (মিউটেশন) হয়েছে। আরো সংক্রামক, আগে থেকে বর্তমান অনাক্রম্যতা (immunity) কে এড়িয়ে যেতে অধিক সক্ষম রূপ ধারণ করেছে। অনুক্রমের তথ্য আমাদের বলছে দুটো রূপভেদ এই ঢেউ এর ইন্ধন যুগিয়েছে। প্রথমতঃ B.1.617 যা গত ডিসেম্বরে ভারতে প্রথম খুঁজে পাওয়া গেছে ও গণসমাবেশকারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং B. 1. 1.7 - প্রথম যা ব্রিটেনে চিহ্নিত হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের মাধ্যমে জানুয়ারীতে ভারতে এসেছে। B.1.617 রূপভেদই বর্তমানে এদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে।

সোমবার [অর্থাৎ ১০ই মে] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) B.1.617 কে 'উদ্বেগজনক রূপভেদ' আখ্যা দিয়েছে। .. [পরীক্ষায়] দেখা গেছে B. 1. 617 অধিক সংখ্যায় ভাইরাস ও ফুসফুসে ক্ষত সৃষ্টি করছে তার উৎস B. 1 ভাইরাস থেকে। এটা আবার তিন রকম উপধারায় বিভাজিত হয়েছে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন দিল্লি হাসপাতালে B. 1. 617. 2 প্রকারভেদ ভ্যাকসিনের প্রতিরক্ষা ভেঙে সংক্রমণ ঘটিয়েছে। এটা রবিবারের রিপোর্ট এবং প্রাথমিক পর্যায়ের।

সোমবার আমেরিকান বিজ্ঞানীরা রিপোর্ট করে যে কোভিড-১৯ থেকে সেরে ওঠা রোগীদের সিরাম দ্বারা অথবা ফাইজার ও মডার্নার ভ্যাকসিন দ্বারা B.1.617.1 প্রকার ভেদের কার্যকারিতা কমিয়ে প্রশমিত করা যাচ্ছে। ভারতীয় গবেষকরাও প্রায় একই ফলাফল পেয়েছেন ২৩শে এপ্রিল।

এই প্রকারভেদগুলো ভারত জুড়ে প্রধানতঃ ভ্যাকসিন নেননি এমন জনসংখ্যার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জনস্বাস্থ্য আধিকারিকরা এখানে মূলতঃ নির্ধারণ করার চেষ্টা করছেন দ্বিতীয় ঢেউ কখন

চূড়ায় উঠবে, সে ঢেউ কত উঁচু হবে এবং কখন তা শেষ হবে। এর হিসাব যথেষ্ট পার্থক্যকারী মতামত দিচ্ছে। ভারত সরকার সুপারমডেল গোষ্ঠীর গণনাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে যা বলছে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ৩,৮০,০০০ দৈনিক কেস নিয়ে তা চূড়ায় উঠবে। [অন্য] বিজ্ঞানীদের এক স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীর আন্দাজ মে মাসের মধ্যভাগে ৫ থেকে ৬ লাখ কেস নিয়ে চূড়ায় উঠবে। কোভ-ইন্ড-১৯ স্টাডি গ্রুপ – মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আভাস হল মধ্য মে তে ৮-১০ লাখ দৈনিক কেস নিয়ে চূড়ায় পৌঁছবে।

সকল মডেলই এই পূর্বাভাস দিচ্ছে যে ভারতে দ্বিতীয় ঢেউ জুলাই বা আগস্ট পর্যন্ত বজায় থাকবে। অর্থাৎ ৩৫ মিলিয়ন নিশ্চিত কেস এবং সম্ভাব্য ৫০০ মিলিয়ন সংক্রমণ নিয়ে শেষ হবে। এর পরও ভারতে লক্ষ লক্ষ স্পর্শকাতর (Susceptible) মানুষ থেকে যাবেন। তৃতীয় ঢেউ এর সময় ও মাত্রা নির্ভর করবে টিকা পাওয়া মানুষের সংখ্যা, নতুন রূপভেদের উত্থান এবং অতিমাত্রায় সংক্রমণশীল অনুষ্ঠান যেমন বিরাট বিবাহ সমারোহ বা ধর্মীয় উৎসব এড়িয়ে যেতে পারে কিনা তার ওপর।

আমাকে যা সবচেয়ে বিচলিত করছে তা হল হয়তো আমরা ঠিকভাবে চূড়ায় থাকা সংক্রমণকে পরিমাপ করতে পারছি না। তথ্য দেখাচ্ছে সংক্রমণের (কেস) গতির থেকে পরীক্ষার গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে অনেক কম হারে। এমতাবস্থায় সংখ্যা হয়তো আর ওপরে উঠবে না – সংক্রমণের সংখ্যা উঁচুতে ওঠা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে নয় পরীক্ষার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে। রাষ্ট্রীয় গড় পরীক্ষায় পজিটিভ এর হার ২২% এর বেশি। কিন্তু বহু রাজ্যে এই হার তার থেকে আংশকাজনক মাত্রায় বেশি। যেমন গোয়া – ৪৬.৩% এবং উত্তরাখন্ড (যা কুম্ভমেলার আয়োজক) ৩৬.৫% ...।

সবচেয়ে কার্যকরী জনস্বাস্থ্য হাতিয়ার এর মধ্যে ভ্যাকসিন হল একটা। এবং দেখা যাচ্ছে দ্রুতহারে টিকাকরণ করোনা ভাইরাসের বিস্তার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস করছে। ভারত এই যুক্তিসংগত পরিকল্পনা নিয়ে মধ্য জানুয়ারিতে টিকাকরণ শুরু করে যে পর্যায় ক্রমে ৩০০ মিলিয়ন মানুষকে – স্বাস্থ্যকর্মী, সামনের সারির যোদ্ধা এবং তারপর ষাটোর্দ্ধ এবং (আনুষঙ্গিক রোগাক্রান্ত) কোমর্বিডিটি সহ ৪৫ উর্দ্ধদের টিকাদান করা হবে। বিশ্ব জুড়ে ভ্যাকসিনের অগ্রগণ্য সরবরাহকারীরূপে ভারত দুনিয়ার ৪০% সব ধরনের ভ্যাকসিন সরবরাহ করে। দুটো ভারতীয় কোম্পানি – সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং ভারত বায়োটেক একে কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত অবস্থায় ছিল।

কিন্তু মধ্য মার্চ পর্যন্ত কেবল ১৫ মিলিয়ন ডোজ সরবরাহ করা হয়েছে – যা ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১%। টিকাকরণ অভিযান খোঁড়াতে শুরু করে ভারতীয় নেতৃত্বের এই বার্তায় যে দেশ করোনা ভাইরাসের ওপর বিজয় লাভ করেছে। এবং ইউরোপ থেকে আসা সংবাদে যা অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনকে (ভারতের বাজারে কোভিশিল্ড) – যা ভারতের টিকাকরণের প্রধান অবলম্বন – মারাত্মক রক্ত জমাট বাঁধার সাথে যুক্ত করে।

যখন দ্বিতীয় ঢেউ এল কেবল ৩৩ মিলিয়ন মানুষ – জনসংখ্যার মোট ২.৪% একটা করে ডোজ পেয়েছিল এবং ৭ মিলিয়ন পেয়েছিল দুটো ডোজ। ১লা মে, ১৮ বছরের ওপরে সকলের জন্য টিকাকরণ চালু করা হয় কিন্তু বহু রাজ্য ঘাটতির কথা জানায় ও টিকাকরণের গতি কমে যায়। স্থানীয় সরবরাহ জুলাই নাগাদ স্থিতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে কিন্তু তার নিম্ন হার ভারতে সংক্রমণের বর্তমান ঢেউকে এবং মৃত্যুকে মোকাবিলা করতে পারবে না।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন রোগ প্রশমিত করে। কিন্তু বর্তমান সংক্রমণ বিশেষতঃ যখন তার হার এত ব্যাপক – কে সম্ভবতঃ আটকাতে পারে না। যদিও পর্যাপ্ত তথ্য এখনো অপ্রতুল তবু টিকাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে সংক্রমণের জন্য রূপবদলকারী ভাইরাসের হয়তো ভূমিকা আছে।

ভারত টিকাকরণের গতিকে স্থথ হতে দিতে পারে না। এখন তাকে দৈনিক ৭.৬ মিলিয়ন থেকে ১ কোটি ডোজ দেবার লক্ষ্যমাত্রা রাখতে হবে। এজন্য ভ্যাকসিন সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে এবং সরবরাহ কেন্দ্র দ্বিগুণ করতে হবে। এই মুহূর্তে কেবলমাত্র ৫০,০০০ কেন্দ্রে ভারতীয়রা টিকা নিতে পারে আমাদের আরো অনেক বেশি চাই। এর মধ্যে কেবলমাত্র ৩% টিকাদান কেন্দ্র বেসরকারী ক্ষেত্রে; এখানে সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা যায়।

এই সমস্ত প্রস্তাবগুলো ভারতে আমার সহযোগী বৈজ্ঞানিকদের ব্যাপক সমর্থনপুষ্ট। কিন্তু তারা তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করার প্রশ্নে দৃঢ় প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছেন। ৩০শে এপ্রিল ৮০০-র বেশি ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন এই দাবি নিয়ে যে – তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক যা আরো অধ্যয়ণ, পূর্বাভাস ও ভাইরাস দমন করতে সাহায্য করে। ভারতে যে বিশ্বমহামারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে তার দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে আরো একটা বিষয় – তা হল তথ্যের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ। যে মানবীয় মূল্য আমরা সহ্য করছি তা এক স্থায়ী ক্ষত ছেড়ে রেখে যাবে।■

সমাজ দর্পণ ঃ

লখিন্দরের ভেলা আজও ভাসে জলে!

– পঞ্চানন মন্ডল

এটা বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে ভর করে আমরা মহাবিশ্বের রহস্য জানছি। চন্দ্র বা মঙ্গল অভিযান করছি। সবার হাতে স্মার্টফোন। দুনিয়া আজ হাতের মুঠোয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। অত্যাধুনিক নানা চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। বিভিন্ন মারণ রোগের টিকা আবিষ্কার হয়েছে। সেই যুগে দাঁড়িয়ে ভাবা যায় না একটি সাপের কামড়ে মৃত কন্যাকে তার পিতামাতা সে প্রাণ ফিরে পাবে বলে কলা গাছের ভেলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। সেই মনসামঙ্গল কাব্যের লখিন্দরকে যেমন ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনটা সম্প্রতি ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের একগ্রামে। অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার কিভাবে এখনো এই জেট যুগে সমাজের কিছু মানুষের মনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে তা এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের ছোট মোল্লাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিদাসপুর গ্রামের ঘটনা। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বাবার সঙ্গে ঘুমিয়েছিল তার বাচ্চা মেয়েটি। রাতে তাকে সাপে কামড়ায়। সাপের বিষের যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা মেয়েকে নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে না নিয়ে, তার পরিবারের লোকজন তাকে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওঝা প্রায় তিনঘন্টা ধরে ঝাড়ফুক তাকতুক করে। কিন্তু মেয়েটি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে দেখে বাড়ির লোকজন তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে ছোটে। কিন্তু ততক্ষণে সময় বয়ে গিয়েছে অনেকটা। বিষাক্ত সাপে কামড়ালে যেখানে ১০০ মিনিটের মধ্যে ১০ ভায়াল এন্টিভেনাম দিলে হয়তো মেয়েটিকে বাঁচানো যেত। কিন্তু হায়! অনেক দেরী হয়ে গেছে। চিকিৎসকরা জানিয়ে দিলেন সব শেষ। শিশুটি মৃত।

এমন মৃত্যু গ্রামে-গঞ্জে বহু ঘটছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সাপে কাটলে মা মনসা কিন্তু বেহুলার প্রার্থনায় 'আজকাল আর সাড়া দেন না'। লখিন্দর-এর ভেলা ভেসেই যাবে অবেলায়। আপনার প্রিয়জনকে হারাতে হবে বিনা চিকিৎসায়। তাই আসুন জেনে নিই সাপের কামড় কিভাবে এড়ানো যাবে আর সাপে কামড়ালে কি করতে হবে।

সাপ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা

সাপ মানুষের মতো কোনো সামাজিক প্রাণী নয়। সুতরাং সাপের যুগল বা জোড়া একটি অতিকথন। গরুর বাঁট থেকে দুধ খাওয়ার মত সাপের মুখের গঠন নেই। দুধ বা দুগ্ধ জাত পদার্থ সাপের খাদ্য নয়। দুধকলা দিয়ে কালসাপ কেন, কোনো সাপই পোষা যাবে না।

সাপের স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল। সাপের প্রতিহিংসা নেবার সব গল্পই অতিকথন। সাপ মোটেই হিংস্র নয়।

সাপ একাকী, নির্জনে থাকতে ভালোবাসে। হঠাৎ মানুষের মুখোমুখি হলে মানুষ যেমন পালাতে চায়, সাপও তেমনি ভয় পেয়ে পালাতে চায়। তাড়া করে কামড়ানোর ঘটনা বিরল থেকে বিরলতম দু-একটি প্রজাতির সাপের স্বভাব।

ভারতবর্ষের বেশিরভাগ সাপ নির্বিষ। ওঝারা যাদের বাঁচায় বলে লোকে বিশ্বাস করে তারা নির্বিষ সাপের কামড় খেয়েছে বা বিষধর সাপ কোনো কারণে বিষ ঢালতে পারেনি।

সাপের কামড় এড়ানোর উপায়

যে কোনো সাপের সামনা সামনি পরে গেলে, একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। যেহেতু সাপের দৃষ্টি ও ঘ্রানশক্তি অতি ক্ষীন, আপনার 'অবস্থান' বুঝতে না পারলে এমনিই চলে যাবে। সাপের তীব্রতম অনুভূতির স্থান তার পেটের 'সাদা' অংশ, আপনি ছুটলে মাটির কম্পন থেকে সাপ আপনার 'অবস্থান' বুঝে নেবে।

যে অঞ্চলে সাপের আধিক্য, সেখানে চলাচলের সময় হাতে লাঠি জাতীয় কিছু রাখুন এবং সেটি মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে হাঁটুন, সাপ তার স্বাভাবিক জৈব প্রবৃত্তি বশে, পালিয়ে যাবে। রাতে হাতে টর্চ রাখুন। মনে রাখতে হবে সাপ অত্যন্ত ভীতু, আত্মরক্ষার তাগিদ ছাড়া সে কামড়ায় না।

বাড়ির আশেপাশে সাপ আসে খাবার সন্ধানে। তাই বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। কার্বলিক এসিডের বোতল রেখে সাপ দূরে রাখা যায় না।

দুটি একই প্রজাতির সাপকে পাশাপাশি দেখলে এড়িয়ে চলুন। সম্ভবতঃ পুরুষ ও স্ত্রী, যৌন মিলনের তাগিদে কাছাকাছি (সাপ স্বভাবত একা থাকতে পছন্দ করে) এই অবস্থায় তাদের প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করা শক্ত। তাছাড়া এলাকা দখলের জন্য দুটি পুরুষ সাপও লড়াই করে (এটাকে অনেকে ভুল করে সাপের শঙ্খ লাগা ভাবে।)

সাপ কামড়ালে স্থানীয় লক্ষণ

দংশন চিহ্ন থাকতে পারে। আদৌ নাও থাকতে পারে। একটি বা দুটি দাঁতের দাগ থাকতে পারে। ছড়ে যাওয়ার দাগ থাকতে পারে। ওই দাগ দেখে বোঝা অসম্ভব যে কি ধরনের সাপে কামড় দিয়েছে। দংশন স্থানে ফোলা ও ব্যথা থাকবে। ফোলাটি আকার আয়তনে বাড়তে থাকবে।

অন্যান্য লক্ষণ

চোখ ঢুলু ঢুলু বা শিবনেত্র, চোখে ঝাপসা দেখা, কথা জড়িয়ে আসা। রুগী আচ্ছন্ন হতে থাকলে তার সাথে অনবরত কথা বলে তাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। গলা ব্যথা। পেটে ব্যথা। শরীরের নানা জায়গা থেকে রক্ত ক্ষরণ। এগুলি বিষাক্ত সাপের কামড়ের বড় লক্ষণ।

ক্ষত স্থানের পরিচর্যা

ক্ষতস্থানে বরফ ঘষবেন না। ঠান্ডা বা গরম সেঁক দেবেন না। ক্ষতস্থানটিকে চেরা-কাটা করবেন না, তাতে শিরা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওভাবে বিষ বের হয় না। ক্ষতস্থান থেকে চুষে বা পাম্প করে রক্ত বের করবেন না। ক্ষতস্থানে কোনও রকম কেমিক্যাল, চুন ইত্যাদি লাগাবেন না। এতে রোগ নির্ণয়ে অসুবিধে হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

শান্ত থাকতে হবে। দৌড়ানো বা সাইকেল চালানো বারণ। এসবে বিষ আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। হাঁটাচলা যথা সম্ভব কম। যে হাতে বা পায়ে দংশন হয়েছে সেই অঙ্গটিকে স্প্লিন্ট ব্যবহার করে তার নাড়াচাড়া বন্ধ রাখতে হবে যেমনটি করা হয় হাত পা ভেঙে গেলে। কোনো অবস্থাতেই শক্ত বাঁধন বা ট্যুরনিকেট বা তাগা ব্যবহার করবেন না। এভাবে বিষ ছড়ানো আটকানো যায় না। বরঞ্চ রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে মারাত্মক ক্ষতি, যেমন গ্যাংগ্রিন হতে পারে। চুড়ি, বালা, আংটি খুলে রাখবেন। রোগীকে আশ্বস্ত করতে হবে। আমাদের দেশের ৭০% সাপ বিষহীন। কামড়ের সময় সাপের বিষ থলিতে পূর্ণ মাত্রায় বিষ নাও থাকতে পারে। ছোবল দিলেই বিষ ঢালবে এমনটা নয়।

রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনও ওষুধ খাওয়াবেন না। দংশনের পর মদ খাবেন না। দ্রুত সবচেয়ে কাছাকাছি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান।

নির্দিষ্ট চিকিৎসা

রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব (১০০ মিনিট) এর মধ্যে শয্যা বিশিষ্ট কোনো হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বাইকে দুজনের মাঝে রোগীকে বসিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

ঝাড়ফুঁক, বিষ পাথর, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি চিকিৎসার শরণাপন্ন হবেন না। ওসব করে কোনো ফল পাওয়া যায় না। মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়, যার ফলে মৃত্যু হতে পারে।

আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে সাপে কাটা রোগীর শারীরিক লক্ষণ দেখে কি জাতীয় বিষ ঢুকেছে বা আদৌ ঢুকেছে কিনা তা স্থির করা হয়। তাই সাপ, জ্যান্ত বা মৃত, ধরে আনলে বা মোবাইলে ছবি তুলে আনলে সেটা চিকিৎসকের কোনো কাজে লাগে না। মনে রাখবেন চিকিৎসক তার শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ, তিনি সর্প বিশারদ নন। সাপের ফনা দেখে বিষ আছে কি নেই চেনা যায় না। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখতে হয়।

কোনো অনিবার্য কারণে রোগীর মৃত্যু হলে দাহ বা কবর দিন। ভুলেও নদীতে কলা গাছের ভেলাতে ভাসাবেন না। মৃত মানুষ জ্যান্ত হয়ে কখনোই ফিরে আসবে না। এটা একটা অন্ধবিশ্বাস।

সব সরকারি হাসপাতালে সাপের বিষ এর প্রতিষেধক বা এন্টি স্নেক ভেনাম বিনা পয়সায় পাওয়ার কথা। না পাওয়া গেলে জনপ্রতিনিধি ও সরকারী আধিকারিকদের কাছে সংগঠিতভাবে দাবি করুন।

রোগী জটিল হলে ভেন্টিলেটর বা ডায়ালিসিস এর প্রয়োজন হয়, যে গুলি কেবলমাত্র বাছাই করা হাসপাতালে পাওয়া যায়। এটি একটি বড় সমস্যা। এই কারণে প্রতিটি ব্লক হাসপাতালে ভেন্টিলেটর, আইসিইউ, ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত টেকনিশিয়ান ও চিকিৎসক থাকতে হবে।

সাপের বিষ এর প্রতিষেধক (এন্টি স্নেক ভেনাম/সিরাম) তৈরী হয় দক্ষিণ ভারতে। সেগুলি আজকাল কিছু ক্ষেত্রে বাংলার সাপের বিষ এর বিরুদ্ধে কাজ করছে না। বাংলায় ওই প্রতিষেধক তৈরির কাজ শুরু করা আশু প্রয়োজন।

গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ হাসপাতালে সাপের কামড়ের চিকিৎসার প্রাথমিক ওষুধগুলির সরবরাহ সুনিশ্চিত করা আশু প্রয়োজন। জেলা স্তরের পাশাপাশি মহকুমা স্তরেও ডায়ালিসিস এর ব্যবস্থা করাও আশু প্রয়োজন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি কালে কেউ সাপের কামড়ে বিনা চিকিৎসায় বা ভুল চিকিৎসায় মারা যাবেন এটা মানা যাবে না।■

ধর্মবিশ্বাস বনাম বিজ্ঞান ঃ

জম্মু-কাশ্মিরের অমরনাথ গুহার শিবলিঙ্গ কি অলৌকিকতার নিদর্শন?

– রঞ্জিত চক্রবর্তী

জম্মু-কাশ্মিরের অমরনাথ যা শ্রীনগর শহর থেকে দুর্গম পাহাড়ি পথে প্রায় ১৪১ কি.মি দূরে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৮৮৮ মিটার (১২,৭৫৭ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত এক গুহা। এই গুহার অভ্যন্তরে এক বরফের শিবলিঙ্গ আছে। এটি সনাতন হিন্দু ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে এক বিস্ময়কর, অলৌকিক পবিত্র স্থান হিসাবে বিবেচিত এবং প্রতিবছর মে মাস থেকে অগাস্ট মাসে গুহা পূজাচর্নার জন্য খুলে দেওয়া হয়। শিবলিঙ্গ স্বরূপ বরফের তৈরি এই ভূমিরূপ (Landform) টি নিয়ে গল্প কাহিনীর শেষ নাই। পুরানে বলা হয় যে ঋষি ভৃগু এই অমরনাথের গুহা প্রথম আবিস্কার করেন। ঐতিহাসিকরা বলেন যে একজন মুসলমান রাখাল বুটা মালিক প্রথম এই গুহা এবং তার ভিতরের শিবলিঙ্গ আকৃতির বরফের স্তুপটি দেখতে পেয়ে তার প্রভুকে এটি জানান। একজন ফরাসী ডাক্তার ফ্রাঙ্কোয়িক বারনিস ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে কাশ্মির বেড়াতে এসে এই গুহাটি আবিস্কার করে তাঁর রচিত গ্রন্থে "ট্রাভেল ইন মুঘল এম্পায়ার"-এ এর উল্লেখ করেন।

২০১১ খ্রিস্টাব্দে অমরনাথ মন্দির ও তার শিবলিঙ্গ নিয়ে এক বিতর্ক তৈরি হয়। বিশিষ্ট নাগরিক সমাজী তথা মানবাধিকার কর্মী স্বামী অগ্নিবেশ মন্তব্য করেন অমরনাথ গুহার বরফের পিন্ড ভগবান নয়, এটি সহজ সরল বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এমন এক বস্তু। পৃথিবীর এত উঁচুতে গুহায় যে তাপমাত্রা থাকে তাতে গুহার ছাদের জল চুঁয়ে এসে বরফের পিন্ডরূপে জমা হবেই। এই গুহায় প্রতিবছর পূজাচর্নার করতে পুণ্যার্থীরা আসেন এবং সেই সময় বহু মানুষ মারা যান। অমরনাথ যাত্রায় সেনা লাগানো রাষ্ট্র দ্বারা অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্রয়দান।"

স্বামী অগ্নিবেশের এই মন্তব্য নিয়ে প্রবল সোরগোল এবং আদালতে মামলা হয়। স্বামী অগ্নিবেশকে হিন্দুত্ববাদীরা নানাভাবে হেনস্থা করেন এবং খুনের হুমকীও দেন। সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেন "মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা উচিৎ নয়"। স্বামী অগ্নিবেশও পাল্টা প্রচার করেন অমরনাথ যাত্রায় হিমালয়ের পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে এবং জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে, তাই এই যাত্রা বন্ধ করতে হবে। গত ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২০, ৮০ বছর বয়সে স্বামী অগ্নিবেশের মৃত্যুর ফলে বিষয়টি ধামাচাপাও পড়ে যায়।

যাই হোক স্বামী অগ্নিবেশের মন্তব্য এবং তার প্রতিক্রিয়ায় যা ঘটেছে বর্তমান রচনার বিষয়বস্তু সেই বিতর্ক এবং তা থেকে উত্থিত রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়। আমাদের চর্চার বিষয় বলপূর্বক কারও কোন বিশ্বাসে আঘাত করাও নয়, ওই শিবলিঙ্গ সদৃশ বস্তুটি অলৌকিক না প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কোন বস্তু তা জানা এবং অবিজ্ঞান প্রসূত অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হওয়া।

ভূবিজ্ঞানীরা বলেন এটি একটি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ভূমিরূপ বা Landform. পবর্তের গুহায় প্রধানত দুইপ্রকার ভূমিরূপ দেখা যায়। একটিকে বলে **স্ট্যালাকটাইট** (Stalaclite) এবং অন্যটিকে **স্ট্যালাগমাইট** (Stalagmite)।

স্ট্যালাকটাইট হল লম্বা কোণাকৃতির তুষারদন্ড বিশেষ যা পাহাড়ের গুহার ছাদ থেকে নিচের দিকে ঝুলে থাকে এবং তৈরি হয় পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে থাকা রাসায়নিক উপাদান সমৃদ্ধ জল গুহার ছাদ থেকে অধঃক্ষেপণের ফলে।

স্ট্যালাগমাইট হল পবর্তের গুহায় গুহার ছাদ থেকে রাসায়নিক সমৃদ্ধ জল থেকে গুহার মেঝেতে অধঃক্ষেপিত পদার্থ থেকে সৃষ্টি হওয়া এবং উপরের দিকে বাড়তে থাকা লম্বা কিন্তু মাথার দিকে গোলাকার ঢিপি বা স্তুপ বা পিন্ড।

রাসায়নিক মিশ্রিত জল থেকে পবর্তের গুহায় যে স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট সৃষ্টি হয় তা কার্বোনেট বা চুনাপাথর (যেমন অন্ধ্রপ্রদেশের আরাকুভ্যালি গুহায় দেখা যায়), ওপাল, চ্যালসিডনি (উভয়ই সিলিকাজাত), লিমোনাইট (লৌহজাত) এবং বিভিন্ন সালফাইডজাত খনিজ। স্ট্যালাকটাইটের ঝুলন্ত অংশের শেষভাগটি সবসময়ই ছুঁচালো হয় এবং স্ট্যালাগমাইটের সর্বোচ্চ অংশের আকার গোল বা চ্যাপ্টাকৃতির। অগ্নুৎপাতজনিত জলীয় রাসায়নিক দ্রবণ থেকেও এমন ভূমিরূপ পাহাড়ের গুহায় তৈরি হতে পারে।

এই স্ট্যালাকটাইট বা স্ট্যালাগমাইট কোন বিশেষ রাসায়নিক খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি না হয়ে শুধুমাত্র জল বা

➔

কুসংস্কার টিঁকিয়ে রাখে কারা ঃ

ধর্মকে বিজ্ঞানের মোড়কে প্রচার না করলে বাজারে তা আর খাচ্ছে না!

– জয়ন্ত শীল

বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় বিকাশের যুগে ধর্মকে ছদ্মবিজ্ঞানের মোড়কে পেশ না করলে আধুনিক প্রজন্ম তা আর খাচ্ছে না। ধর্মবাদীরা তাই ছদ্মবিজ্ঞানের মোড়কে ধর্মকথা প্রচার শুরু করেছে প্রিন্ট মিডিয়া, টেলিমিডিয়া সহ সোশাল মিডিয়াতেও। সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদীরা সোশাল মিডিয়ায় ভারতের মানচিত্রে ৮টি শিবমন্দিরের ছবি এবং ভৌগোলিক অবস্থান চিত্রিত করে লিখেছে "আজব এক তথ্য যা আমাদের চিন্তা করা উচিৎ।" বলা হয়েছে ভারতের ৮টি প্রাচীন মন্দির যথা কেদারনাথ, কলহস্তী, একাম্বরনাথ, থিরুবনইকবাল, চিদাম্বরম নটরাজ, রামেশ্বরম, কালেশ্বরম এবং থিরুবনমালি মন্দিরগুলি কয়েক শতাব্দী আগে জিপিএস ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ছাড়াই স্থপতিরা প্রায় একই দ্রাঘিমারেখা (৭৯° পূর্ব) বরাবর স্থাপন করেছেন, যা আশ্চর্যজনক এবং তখনকার যুগের স্থপতিকাররা যে উন্নতমানের প্রযুক্তির

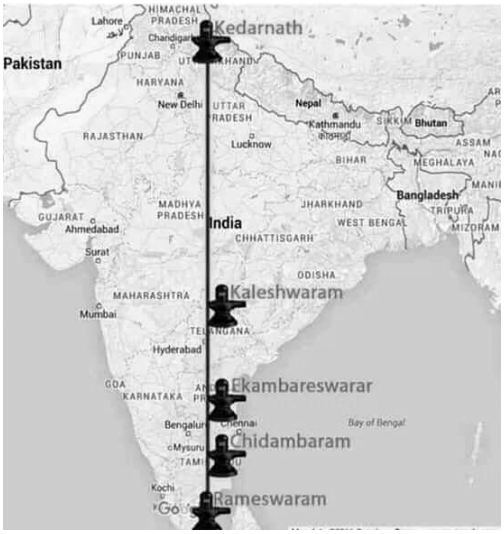

➔

● *জম্মু-কাশ্মিরের অমরনাথ গুহারশিবলিঙ্গ কি অলৌকিকতার নিদর্শন?*

বরফ দিয়েও তৈরি হতে পারে। এগুলিকে বলে বরফ স্ট্যালাকটাইট ও বরফ স্ট্যালাগমাইট।

বরফ স্ট্যালাগমাইট হল সুউচ্চ পর্বতের গুহায় বছরের কোন একটি বিশেষ ঋতুতে বা সারাবছর ধরে তৈরি হওয়া স্ট্যালাগমাইট। এক্ষেত্রে পাথরের ফাটল থেকে জলের ফোঁটা গুহার ছাদ থেকে গুহার মেঝেতে পড়ে শূন্যডিগ্রির (সেলসিয়াস) নিচের তাপমাত্রা থাকার কারণে বরফ কুচি হিসাবে জমে জমে সৃষ্টি হয়, যদি গুহার ভিতরের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে এবং গুহার বাইরের ও ফাটলের মধ্যকার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি থাকে। এছাড়া জলীয় বাষ্প থেকেও গুহার ভিতর বরফের কণা সৃষ্টি হয়ে তা জমে বরফের স্ট্যালাগমাইট তৈরি করতে পারে।

ভূবিজ্ঞানীরা জম্মু-কাশ্মিরের অমরনাথ গুহায় ঐ 'শিবলিঙ্গ'কে তাই প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট এক বরফের স্ট্যালাগমাইট বলেন, যা বছরে একটা সময় প্রায় ৩০ ফুটের স্তম্ভাকৃতির বরফের ভূমিরূপ তৈরি করে আবার তাপমাত্রা বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে ছোট হতে হতে প্রায় মিলিয়ে যায়। প্রতিবছর জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর এই বরফের স্তুপের উচ্চতা ও বেধের মাপ স্থির হয়।

ভূবিজ্ঞানীরা বলেন এমন বরফের স্ট্যালাগমাইট অলৌকিক (যা ব্যাখ্যা করা যায় না) তো নয়ই, বিরলও নয়। পৃথিবীর বহু সুউচ্চ পর্বতমালার গুহায় এমন বরফের স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট পাওয়া যায়। ইউরোপ মহাদেশের অস্ট্রিয়ার সালজবার্গ প্রদেশে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বরফের স্ট্যালাগমাইট (সনাতন হিন্দুদের চোখে বরফের শিবলিঙ্গ) পাওয়া যায়। এই স্ট্যালাগমাইট অমরনাথ গুহার স্ট্যালাগমাইট (শিবলিঙ্গ'র) তুলনায় আকারে অনেক বড় (৭৫ ফুট বা ২৩ মিটার লম্বা)। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে একজন অস্ট্রিয়ান পর্যটক আলেকজান্ডার ভন মর্ন এটি আবিষ্কার করেন।

অস্ট্রিয়ার মানুষ প্রধানত খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী বলে এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ অবগত না থাকায় এবং তার প্রতি বিশ্বাস না থাকায় ঐ বরফের স্ট্যালাগমাইটকে শিবলিঙ্গ রূপে পূজা করেন না এবং এটা নিয়ে অলৌকিকত্বের কোন প্রচারও নেই। সুতরাং অজ্ঞানতা থেকে অলৌকিকতার জন্ম হয়, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তা দূর করে।■

অনুশীলন করতেন তা নাকি এ যুগেও বিস্ময়কর!

এছাড়া রচনায় এও বলা হয়েছে যে সনাতন ধর্মে জোর্তিবিজ্ঞান চর্চায় উজ্জনিয়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল এবং এই মন্দির থেকে দেশের অন্য বিখ্যাত শিব মন্দিরগুলি সবই ১১ কি.মি-এর গুণিতক সংখ্যার দূরত্বে অবস্থিত। যেমন উজ্জনিয়ীতে থেকে সোমনাথ ৭৭৭ কি.মি, উজ্জনিয়ী থেকে কাশী বিশ্বনাথ ৯৯৯ কি.মি দূরত্বে অবস্থিত।

রচনায় এও বলা হয় যে সনাতন ধর্মতত্ত্বে কোন কিছুই অপ্রয়োজনীয় ছিল না এবং বিনা কারণে কিছুই করা হয় নি। অতীতে সনাতন ধর্মে উজ্জয়িনীকে বিবেচনা করা হত বিশ্বের (ভূগোলকের) কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে। আনুমানিক ১০০ বছর আগে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা যখন ভূগোলকের মাঝামাঝি একটি কাল্পনিক রেখা টানেন তখনও এর কেন্দ্রীয় এলাকা ছিল ঐ উজ্জয়িনী। বর্তমান সময়েও সূর্য ও মহাকাশ নিয়ে গবেষণার কাজ করতে অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা উজ্জয়িনীতেই আসেন।

প্রথমেই বলা দরকার পছন্দমত কিছু তথ্যকে একত্রে জড়ো করে কিছু গাণিতিক সংখ্যা সাজিয়ে বললেই তা বিজ্ঞান হয় না। এই রচনায় দেশের ৮টি প্রধান শিবমন্দিরের উল্লেখ করা হয়েছে যা ৭৯° পূর্ব দ্রাঘিমারেখার আশপাশে অবস্থান করে। কিন্তু সারা ভারতে কি শুধুমাত্র এই কয়টি প্রাচীন ও বিখ্যাত শিবমন্দির আছে? উল্লিখিত ৮টি শিবমন্দিরের যথা কেদারনাথ, কলহস্তী, একাম্বরনাথ, থিরুবনইকবাল, চিদাম্বরম নটরাজ, রামেশ্বরম, কালেশ্বরম, থিরুবনমালি মন্দির ছাড়া অন্য বিখ্যাত শিবমন্দির যেমন অমরনাথ (জম্মু ও কাশ্মীর), কাশী বিশ্বনাথ (উত্তর প্রদেশ), কৈলাশনাথ (মহারাষ্ট্র), সোমনাথ (গুজরাত), তারকেশ্বর (পশ্চিমবঙ্গ), লিঙ্গরাজ (ওড়িশা), বৈদ্যনাথ (ঝাড়খন্ড), মুরুদেশ্বর (কর্ণাটক) ইত্যাদির নাম এই তালিকায় নেই কেন? কারণ ঐ প্রাচীন ও বিখ্যাত শিবমন্দিরগুলি ৭৯° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে অনেক দূরে। যেমন অমরনাথ (৭৫.৫০০° পূর্ব), কাশী বিশ্বনাথ (৮৩.০৩৮২° পূর্ব), লিঙ্গরাজ (৮৫.৫০০১° পূর্ব) দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে উজ্জয়িনী ভূগোলকের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং ১০০ বছর আগে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা যখন ভূগোলকের মাঝামাঝি একটি কাল্পনিক রেখা টানেন তখনও এর কেন্দ্রে ছিল উজ্জয়িনী। এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। উজ্জয়িনী শহরের ভৌগোলিক অবস্থান হল ২৩.১৭° উত্তর (অক্ষাংশ) এবং ৭৫.৭৯° পূর্ব (দ্রাঘিমাংশ)। ভূবিজ্ঞানীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীণউইচ এর পশ্চিম দিকের একটি বিন্দু দিয়ে একটি ৯০° দ্রাঘিমারেখা টানেন যা উত্তরমেরুর সাথে আর্টিক সমুদ্র, উত্তর আমেরিকা, মেক্সিকো উপসাগর, মধ্য আমেরিকা, প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ সাগর, আন্টার্কটিকা হয়ে দক্ষিণ মেরুকে যুক্ত করেছে। এই রেখা পৃথিবীকে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে ভাগ করেছে কাল্পনিকভাবে দিনের হিসাব করার সুবিধার জন্য। ভারত তথা মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের উজ্জয়িনী এই রেখা থেকে কয়েক হাজার কি. মি দূরে অবস্থিত।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে এখনও জ্যোর্তিবিজ্ঞান গবেষণায় উজ্জয়িনী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। আধুনিক জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চার সাথে যারা যুক্ত তারা এই বাক্যের জবাব দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবেন, কারণ পৃথিবীকে দ্বিমাত্রিক একটি চ্যাপ্টা থালার মত এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য, চন্দ্র, রাহু, কেতু সহ ৯টি গ্রহ ঘূর্ণায়মান এই জ্যোর্তিষচর্চা যা গ্রীস থেকে ভারতে আমদানি হয়ে চর্চা হত তা বহুযুগ পূর্বেই খারিজ হয়ে গেছে। আধুনিক জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চায় পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক স্থান থেকে তা চর্চা করার কোন প্রয়োজন নেই।

চতুর্থতঃ বলা হয়েছে উজ্জয়িনী এমনই গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম তথা বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র যার থেকে ভারতের বিখ্যাত মন্দিরগুলি ১১ কি. মি এর গুণিতক দূরত্বে অবস্থিত। আবার গাণিতিক জাগলারি করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রয়াস! পছন্দমত জায়গা বেছে নিয়ে এই গাণিতিক জাগলারি করা হয়েছে। উজ্জয়িনী থেকে অমরনাথ মন্দিরের দূরত্ব (৫১৮ কি. মি), লিঙ্গরাজ মন্দিরের দূরত্ব (১০৮৯ কি. মি), তারকেশ্বর মন্দিরের দূরত্ব (১৫৫৩ কি. মি) কে দেখানো হয়নি কারণ তাহলে এই গল্পটা জমবে না।

পঞ্চমতঃ কয়েক শতাব্দী বা কয়েক হাজার বছর আগে গড়া এইসব মন্দিরগুলি যখন স্থাপিত হয় তখন সেখানকার স্থপতিকারদের ভারতবর্ষ বা বিশ্বের ভূগোল সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ তো দূর, কি. মি বা মাইলকে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবেও বিবেচনা করার স্তরে তারা ছিলেন না। কারণ এইসব এককগুলি সম্পর্কে কোন ধারণা তখনও সৃষ্টি হয় নি।

সবশেষে বলা দরকার যে ধর্মবাদীরা ধর্মতত্ত্বকে শুধু বিশ্বাস হিসাবে মানুষের মধ্যে টিকিয়ে রাখতে পারছেন না। কারণ ধর্মতত্ত্ব সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে কোন কাজে আসে না। ভাববাদের চর্চা পেটের ক্ষুধা মেটায় না, বাস্তব জীবনে কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে মানুষকে বাঁচতে হয়। প্রতিমুহূর্তে বিজ্ঞানের আশ্রয়ে মানুষকে বাঁচতে হয়। তাই ধর্মতত্ত্বও বিজ্ঞানসম্মত এবং আধুনিক বিজ্ঞানের চেয়েও শক্তিশালী এই ধারণা প্রচারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ধর্মবাদীদের। তাই এই ছদ্মবিজ্ঞানের প্রচার।■

উপেক্ষিত বিজ্ঞানী রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন

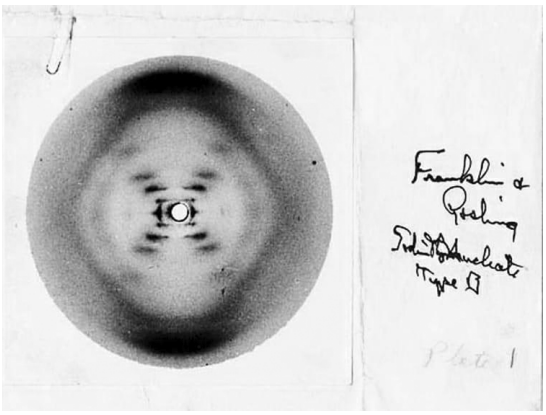

প্রথম ডিএনএ-এর এক্স-রে চিত্র (ফটোগ্রাফ ৫১)

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল পরিবারগুলো মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিল। লন্ডনের নটিংহিল শহরে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জুলাই এমনই এক সম্পন্ন ইহুদী পরিবারে জন্ম হয় রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিনের। ছোট থেকেই মেয়েটির স্বপ্ন ছিল বিজ্ঞানী হওয়ার। পরিবারের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে ভর্তি হয় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নিউয়েনম্যান কলেজে, আর তার পাঠ্য ছিল পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যা। তিনি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক হন।

পড়াশোনা শেষ করে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি যোগ দেন ব্রিটিশ কয়লা ব্যবহার গবেষণা সংস্থাতে। সেখানে তিনি কার্বন ও কয়লার শোষণ ধর্মের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গবেষণার উপর পাঁচটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। পরে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই কয়লা সংক্রান্ত গবেষণার ভিত্তিতেই ডক্টরেট পান। এরপর তিনি প্যারিসে অবস্থিত ফ্রান্সের জাতীয় কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে জাক মেরাঁর সাথে কাজ করেন ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এখানে তিনি এক্স-রের অপবর্তন (ডিফ্রাকশন) প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্বন অণুর কাঠামো নিয়ে কীভাবে গবেষণা করা যায় সেই শিক্ষালাভ করেন। উত্তপ্ত কার্বনে গ্রাফাইট গঠনের ফলে যে কাঠামোগত পরিবর্তন আসে সে ব্যাপারে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন। এভাবেই তিনি এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। গবেষণার জগতে বিশেষ পরিচিতিও পান।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনের কিংস কলেজে গবেষক হিসাবে যোগ দেন। সে সময় ডিএনএ-র রাসায়নিক গঠন ও কাঠামো নিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রায় কিছুই জানতেন না। রোজালিন্ড প্যারিসে শেখা এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি পদ্ধতি ডিএনএ সংক্রান্ত গবেষণায় প্রয়োগ করেন। রোজালিন্ড তাঁর কাজের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি সূক্ষ্ম তন্তুর মতো 'কাফথাইমান ডিএনএ স্যামপল্' ব্যবহার করেছিলেন। **নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছিলেন জৈব অণুর ছবি তোলার উপযুক্ত এক এক্স-রে ক্যামেরা যা দিয়ে ডিএনএ-এর চমৎকার সব ছবি উঠতে লাগল। তিনি ডিএনএ-র ঘনত্ব বের করেন। তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন ডিএনএ-র আকৃতি কুন্ডলাকার। ডিএনএ অণুতে ফসফেট-চিনির অণুগুলির অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হন।** বিভিন্ন আলোচনাচক্রে রোজালিন্ড গবেষণার এইসব ফলাফল দেখাতেও শুরু করেন। সে সময় অন্য কোনও বিজ্ঞানী ডিএনএ-র ছবি তুলতে সক্ষম হন নি।

কিংস কলেজে একজন সহকর্মী মরিস উইলকিনস এর সঙ্গে ফ্রাঙ্কলিনের সম্পর্ক ভালো ছিল না। সেই সময় ডিএনএ-র গঠন নিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিলেন জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক। তাঁরা ডিএনএ অণুর রাসায়নিক সঙ্কেত থেকে জটিল গাণিতিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরমাণুর দূরত্ব ও কোণ বিশ্লেষণ করে সুগার-ফসফেট বা ফসফেট-চিনির বেসগুলো কীভাবে সাজানো থাকে, তার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। আসলে ডিএনএ একটা অতি লম্বা অণু যার কাঠামোটা তৈরি হয়েছে অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন নামে চার রকম নিউক্লিয়োটাইড বেস আর অসংখ্য সুগার (চিনি) ও ফসফেট অণু নিয়ে। ডিএনএ যদি নিউক্লিয়োটাইড বেসগুলো দিয়ে তৈরি মালা হয় তাহলে সুগার-ফসফেট অণুগুলো মালার পুঁতি। এই সুগার-ফসফেট অণুগুলোর অবস্থান ফ্রাঙ্কলিন নির্ণয় করেছিলেন ডিএনএ-র ছবি তুলে আর ওয়াটসন বীজ গাণিতিক পদ্ধতিতে সেই বিষয়েই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে ছিল না ডিএনএ-র কোনো ছবি, যা তাদের গাণিতিক বিশ্লেষণকে মান্যতা দিতে পারে।

ফ্রাঙ্কলিনের অজান্তে, তাঁর অনুমতি ছাড়াই তাঁর তোলা ডিএনএ-র এক্স-রে চিত্র (ফোটোগ্রাফ-৫১ নামে যা পরে বিখ্যাত হয়েছিল) এবং সমস্ত গবেষণা জাত তথ্য ওয়াটসন এবং ক্রীককে

● *শেষাংশ ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন* ➔

রিপোর্ট ঃ

গণহত্যাকারী পুঁজিপতিশ্রেণীর হাত থেকে পরমাণু বোমার বিপদ এড়াতে চাই পুঁজিবাদের অবসান

বেহালা-ঠাকুরপুকুর ইউনিটের উদ্যোগে বিগত ৮ই অগাস্ট হিরোসিমা-নাগাসাকি দিবস উপলক্ষে একটি ঘরোয়া আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল –

'বিজ্ঞান শ্রেণী নিরপেক্ষ,
অথচ
বিজ্ঞানীদের দিয়েই পরমাণু বোমা বানায়
গণহত্যাকারী পুঁজিপতিশ্রেণী।
এই অবস্থার সমাধান – পুঁজিবাদের অবসান।'

আলোচনা শুরু হয় হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচিত 'শঙ্খচিল' গানটি দিয়ে। এরপর সভায় যা আলোচনা হয় তার সারাংশ নিম্নরূপ ঃ–

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এবং ৯ই অগাস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেই গণহত্যায় অন্ততপক্ষে ১ লক্ষ তিরিশ হাজার অসামরিক জনগণ মারা যান, এর ক্ষয়ক্ষতি আজো অব্যাহত। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এই খুনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনে যায় বিশ্বের অধীশ্বর। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শাসকবর্গ তাদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়।

মানব সমাজের ইতিহাসের উষ্ণালগ্ন থেকে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার অদম্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আগুন সংরক্ষণ ও জ্বালাতে শিখে তাপশক্তি, আলোকশক্তি এমনকী বাষ্পশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি তৈরি করে তাকে কাজে লাগিয়েছে উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। এভাবেই প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়েছে নিজ স্বার্থে। উৎপাদন শক্তির বিকাশ অবধারিতভাবে উৎপাদন সম্পর্ক পাল্টে দিয়ে সমাজে এনেছে শ্রেণী বিভাজন। শ্রেণীবিভক্ত মানব সমাজে মুষ্টিমেয় শাসকরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছে। সেই যুদ্ধে শাসিত জনগণ যুদ্ধের খোরাক হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা আজো অব্যাহত।

পুঁজিবাদের, বিশেষত তার একচেটিয়া যুগে বিশ্বের বাজার ও কাঁচামালের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ বিধ্বংসী রূপ নিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের অনেক বিশিষ্টতার মধ্যে যুদ্ধে পারমাণবিক বোমাকে মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার অন্যতম। **যদিও ইতিহাস বলে এই যুদ্ধের ফয়সালার জন্য এই বোমা নিক্ষেপের কোনো প্রয়োজন ছিল না।**

অনেকেই এই প্রশ্ন তোলেন, পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারকে মানব সমাজের উপযোগী করে তোলা তথা পরমাণু বিজ্ঞানের আবিষ্কার এই বিধ্বংসী ঘটনার জন্য দায়ী। এর উত্তরে বলা যায় বিজ্ঞান অর্থাৎ বস্তুর পরিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যতিরেকে হয়ে চলে অবিরত। বিজ্ঞান শ্রমের হাতিয়ার হিসেবে ছুড়ি আবিষ্কার করেছে। এই ছুড়িকে যদি কারো প্রাণহানির জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে তার দায় কি বিজ্ঞানের? আগুনের আবিষ্কার মানব সভ্যতার যে অগ্রগতি ঘটিয়েছে সেই আগুন কারো ঘর জ্বালাতে ব্যবহার করলে, তার দায় কি বিজ্ঞানের?

বারুদের আবিষ্কার কামানের গোলার জন্ম দিয়েছে, যা খনিজ পদার্থ উৎপাদনে আজো অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আবার এই বারুদ যখন কামানের গোলা হিসেবে নরহত্যার কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তার দায় কি বিজ্ঞানের? তেমনি কোনো মৌলের একটি পরমাণুর মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি রয়েছে, তাকে নির্গত করার বিজ্ঞান আবিষ্কারের পরই তা যেমন মানব সমাজের উৎপাদন বিকাশে বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েছে, তেমনি ঐ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে তৈরি পরমাণু বোমা জাপানে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নরহত্যা ঘটিয়েছে। এই ভয়াবহ নরহত্যা দেখে যদি আমরা বলি পরমাণু থেকে শক্তি উৎপাদনের আবিষ্কার হওয়াই উচিৎ ছিল না এবং পরমাণু গবেষণাকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে, তবে বলতে হয় আগুন, ছুড়ি, বারুদ ইত্যাদি সকল আবিষ্কারই ছিল অপ্রয়োজনীয়। কারণ এগুলির দ্বারা মানুষ সহ জীব জগতে হত্যালীলা সংগঠিত হয়ে আসছে।

বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ প্রকৃতি তথা মানব সমাজের নিয়ম আবিষ্কারের বিরোধী হতে পারে না। কারণ তা সমাজ বিকাশের

পরিপন্থী। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে কিভাবে কাজে লাগাবে তার দায় বিজ্ঞানীর বা বিজ্ঞান গবেষণার হতে পারে না। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের শাসক-শোষক শ্রেণী তার স্বার্থে তথা ব্যাপক জনতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে আসছে। এর দায় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের আবিষ্কারকের নয়।

পরমাণু বিজ্ঞান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত মানুষের ধারণায় পরমাণু ছিল পদার্থের ক্ষুদ্রতম অভিভাজ্য কণা। বিজ্ঞানি জে. জে. থমসন দেখালেন পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস। তাকে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘূর্ণায়নমান ঋণাত্মক আধান যুক্ত ইলেকট্রন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড দেখালেন পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে ধনাত্মক আধান যুক্ত প্রোটন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী জেমস্ চ্যাডউইক দেখালেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সাথে আছে নিস্তরিৎ নিউট্রন। বিজ্ঞানী নিলস্ বোর দেখালেন ঘূর্ণায়মান কক্ষপথে একাধিক ইলেকটনও থাকতে পারে। এর আগে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ থেকে জানা যায় বস্তুর ভর থেকে শক্তির রূপান্তর সম্ভব এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকালে পরমাণুর ইলেকট্রনকে যেমন বার করে আনা যায়, তেমনি অন্য পরমাণুতে তা ঢুকিয়ে দেওয়াও সম্ভব। কিন্তু পরমাণুর কেন্দ্রে যে প্রচন্ড শক্তির দ্বারা প্রোটন ও নিউট্রন একত্রে অবস্থান করছে, তাকে কী করে ভাঙা যায় সে সম্পর্কে তখনও কিছু জানা ছিল না।

পরমাণুর গঠন সম্পর্কে ধারণার বিকাশের পাশাপাশি মৌলের তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জিত হয়। বিজ্ঞানী কুরি দম্পতি থেকে রাদার ফোর্ড – তিনপ্রকার তেজস্ক্রিয় রশ্মির সন্ধান পাওয়া যায় α, β, γ। পরবর্তীতে জানা যায় α হল ধনাত্মক তড়িৎধর্মী প্রোটন কণা। β হল ইলেকট্রন কণা, অথবা পজিট্রন। এবং γ হল উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফোটন কণা। α কণা দিয়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে আঘাৎ করে তা ভাঙা অনেকদিন পর্যন্ত সফল হয়নি। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী অটো হান নিস্তরিৎ নিউট্রন কণা দিয়ে পরমাণু নিউক্লিয়াসে বিভাজন, তৎজনিত শক্তি নির্গমনে সক্ষম হলেন।

পরমাণুর বিভাজন ও তা থেকে বিপুল শক্তি উৎপাদনের জ্ঞান বিশ্বজুড়ে (প্রধানত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার) অসংখ্য বিজ্ঞানীদের সাধনার ফল। তাই একে কোনোভাবেই একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী বা সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত একটি প্রক্রিয়া বলা যায় না। বারুদ এবং নিউটনের প্রোজেক্টাইল গতিকে সামন্ত ও পুঁজিপতিশ্রেণী যেমন তাদের যুদ্ধ বিদ্যায় ব্যবহার করেছে, তেমনি পরমাণু ভাঙার দ্বারা বিপুল ধ্বংসাত্মক শক্তিকে একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীও তাদের মধ্যকার বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। পরমাণু বোমা তৈরি করে সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকেও ধ্বংস করতে চেয়েছিল জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ এবং পরমাণু বোমা

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা অগাস্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে একটি চিঠি লিখে জানান যে পারমাণবিক বোমাও তৈরি করা সম্ভব।

আইনস্টাইনের এই পত্র পেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী দেশের দশটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রে অত্যন্ত গোপনে এই গবেষণা শুরু করে। এই গবেষণার কথা দেশের জনগণ থেকে শুরু করে নির্বাচিত সরকারের প্রতিনিধিদের কেউই (কেবল মাত্র প্রেসিডেন্ট ছাড়া) জানতো না। রাষ্ট্রের মিলিটারীর শীর্ষ অধিকর্তাদের নিয়ন্ত্রণেই চলছিল এই গবেষণা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে এই পরমাণু তৈরির গবেষণাকে বলা হয় ম্যানহাটন প্রোজেক্ট। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে মানব সভ্যতা ধ্বংসকারী এই গবেষণায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা কেন জড়িত থাকলেন? প্রথমতঃ গবেষণার বিকাশ একটা স্তরে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না পরমাণু বোমা আদৌ বানানো সম্ভব কিনা। তাছাড়া শাসকশ্রেণীর গোপন মিশন সম্পর্কে অধিকাংশ বিজ্ঞানী অবগত ছিলেন না। তাঁদের গবেষণাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া গবেষণার এই স্তরে এসে যে এক্সপেরিমেন্টের প্রয়োজন ছিল তার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের ও পরিকাঠামোর প্রয়োজন ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করায় তার হাতেই ছিল সর্বাধিক সুযোগ। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এই প্রোজেক্টে যুক্তই ছিলেন না বা তাঁকে যুক্তও করা হয় নি। **যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শীর্ষ দপ্তর মাত্র বারোজন বিজ্ঞানীকে সমগ্র কর্মকান্ডে যুক্ত করেছিল। যাঁদের পরিচালক ছিলেন বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার।** এই বারোজন বিজ্ঞানী ছিলেন যথাক্রমে ঃ লিও জিওলর্ড, ফন নয়মেন, টেলর, (হাঙ্গেরীও); জর্জ ক্রিস্টিওকোয়োস্কি, রভিনোভিচ (রাশিয়া); রিচার্ড ফাইনম্যান, হান্স বেথে, জেমস্ ফ্রাঙ্ক (জার্মানি); ভিক্টর ওয়াইস্কোপ (অস্ট্রিয়া); এনরিকো ফেরমি (ইতালী); জেমস্ চ্যাডউইক (ব্রিটেন); নিলস্ বোর (ডেনমার্ক)। এই তেরজন বিজ্ঞানী সহ হাজার হাজার বিজ্ঞানীরা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে, যাদের মূল পরিকল্পনা অজানা ছিল।

এই বিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশ অক্ষশক্তি দ্বারা বিতাড়িত এবং যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণকারী ছিলেন। তাঁরা জার্মানিকে রুখতে দ্রুত এই গবেষণা সম্পন্ন করার প্রয়োজন বলে মনে করতেন। এদের মধ্যে একাংশ ছিল শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী (যেমন ডঃ ওপেনহাইমার)। তাই বাস্তবত কতিপয় বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় পরমাণু গবেষণা থেকে বিশ্বযুদ্ধ পুরো

বিষয়টাই হয়ে গেছিল পুঁজিপতিশ্রেণীর অতিবৃহৎ শক্তির জোটগুলির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর যুদ্ধ। সমাজবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করা ছাড়াও জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল বৃহৎ শক্তি হিসেবে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করা।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল, এই যুদ্ধে তারা নিরপেক্ষ অবস্থান নেবে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তারা দুই পক্ষকে অস্ত্র বিক্রি করার পাশাপাশি পরমাণু বোমা তৈরির গোপন কর্মসূচী চালিয়ে গেছে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই অগাস্ট, যুদ্ধে বিদ্ধস্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স পক্ষের নেতা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আটলান্টিক সনদে সাক্ষর করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ যখন এশিয়া-আফ্রিকাতেও ছড়িয়ে পড়েছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে বিজ্ঞানী আর্থার কম্পটন, এনরিকো ফেরমি ও তাঁদের সহযোগীরা পরীক্ষাগারে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হন। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক দপ্তর ওপেনহাইমারের নেতৃত্বে গোপনে নিউ মেক্সিকোতে বিশালাকার কারখানা স্থাপন করে।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে অক্ষশক্তি অর্থাৎ জার্মানি, ইতালি, জাপানের পরাজয় আসন্ন হয়ে পড়ে। ঐ বছরই যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস্-এ অক্ষশক্তি বিরোধী বৃহৎ শক্তিগুলি যুদ্ধ পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণের জন্য সম্মেলন ডাকে। স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যাধীন ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিশক্তির জোটের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গুলি গৃহীত হয়। ঐ বছরই ব্রেটনউড সম্মেলনে বিশ্বের নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মুদ্রার স্বর্ণমান তুলে দিয়ে মার্কিন মুদ্রা ডলারকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ যে বাজার ও সম্পদ দখলের জন্য এই বিশ্বযুদ্ধ তার ফয়সালা হয়ে যায়।

১৬ই জুলাই ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা সফল হয়। এর আগেই ৮ই মে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত লাল ফৌজের হাতে অক্ষশক্তির নেতা জার্মানি যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। এবং পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নাৎসী জার্মানির হাত থেকে মুক্ত হয়। অক্ষশক্তির অপর নেতা ইতালি ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ আত্মসমর্পণ করেছিল। মিত্রশক্তির বৈঠকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করেছিল জার্মানির পতনের আগে তারা জাপান আক্রমণ করবে না (ইয়েল্টা সম্মেলন এবং তেহরান সম্মেলন দ্রষ্টব্য)। তাই ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ই মে মধ্যরাতে ১৬ লক্ষ লাল ফৌজের বাহিনী জাপান আক্রমণ করে এবং জুলাই মাসের মধ্যেই জাপানকে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়ে বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে দেয়। পাশাপাশি জাপ শক্তির এই পরাজয়ের প্রক্রিয়ায় পূর্ব এশিয়ায় চীন, কোরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে জাপান পিছু হটে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগ্রামরত চীনা জনগণ মুক্তির জন্য সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছয়। এই পরিস্থিতিতে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিশ্বে তার রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং চিরশত্রু শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রাভিযানকে রুখতে ইতিমধ্যে আবিস্কৃত পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এবং ৯ই অগাস্ট তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোসিমা এবং নাগাসাকি দ্বীপে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ সাধারণ অসামরিক জনগণকে হত্যা করে তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজ করেছে। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খন্ডের 'এ্যাটোম বোমা – হিরোসিমা ও নাগাসাকি' অধ্যায়ের শেষাংশতে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে **"প্রকৃতপক্ষে হিরোসিমা দক্ষিণ জাপানের সামরিক ঘাঁটি হইয়া থাকিলেও এবং পারমাণবিক আক্রমণের সময় সেখানে কয়েক হাজার সৈন্য থাকিয়া থাকিলেও সৈন্যদের উপর লক্ষ্য করিয়া কিন্তু বোমা বর্ষিত হয় নাই, নিহত হইয়াছিল অসংখ্য অসামরিক লোক ...।"**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি কিভাবে হয়েছিল, তা নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নানান বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। মার্কিন ঐতিহাসিক ডি. এ. ফ্লেমিং এর চারটি কারণ উল্লেখ করেছিলেন ঃ–

ক. মার্কিন সৈন্যদের জীবন বাঁচাবার স্বাভাবিক তাগিদ

খ. মহাযুদ্ধের স্থায়ীত্বকাল হ্রাস

গ. রণক্ষেত্রে বোমার কার্যকারীতা প্রমাণ করা

ঘ. সোভিয়েত রাশিয়াকে দূরপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ না দেওয়া।

(বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩২)

উপরে বর্ণিত চারটি কারণের ক এবং খ বিন্দুর যে কোনো তাৎপর্যই নেই তা ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। বিন্দু গ এবং ঘ-ই আসলে তাৎপর্যপূর্ণ। এই বোমা তৈরিতে ২৫০ কোটি মার্কিন ডলার খরচ হয়েছিল। কিন্তু এর মারণ ক্ষমতা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতটা তা জানার জন্য বোমা নিক্ষেপ করাই একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বব্যাপী প্রভাব থাকাতে, তথা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিস্তার রুখতে এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে নিজেদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ জরুরি ছিল।

যে ম্যানহাটন প্রোজেক্ট এই পরমাণু বোমার জন্ম দিয়েছিল সেই প্রোজেক্টেরই বিজ্ঞানী থিয়োডর হল, ক্লাউজ ফোকস্, প্রমুখরা (ফাইনম্যানের এই কান্ডে যুক্ত থাকা প্রমাণ করা যায় নি।) গোপনে

বোমার ফর্মূলা শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছিল। এই কারণে এই বিজ্ঞানীরা পুঁজিপতিশ্রেণীর কাছে বিশ্বাসঘাতক এবং শ্রমিকশ্রেণী তথা আপামর জনগণের কাছে মানবতার সৈনিকের মর্যাদা পেয়েছিল। কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপ থেকেও মাছি গলে গেল। কারণ নিরাপত্তাকর্মীরাই তা করতে সাহায্য করেছিল। এর ফলে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে) এবং চীন (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে) এই অন্যায় যুদ্ধকারী পুঁজিপতিশ্রেণী যেন তাদের সমঝে চলে সেই কারণে পরমাণু বোমা বানিয়েও তা শত্রু শিবিরে প্রয়োগ করে নি।

হিরোসিমা দিবসে 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' – এই স্লোগানের ভিত্তিতে আন্দোলন নরখাদক পুঁজিপতিশ্রেণীর হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারবে না। ইতিহাস প্রমাণ করেছে প্রকৃত শান্তির জন্য চাই ন্যায় যুদ্ধ। শত্রুর পরাক্রমকে নত করতে ইঁটের বদলে পাটকেলের ব্যবস্থা প্রয়োজন। জার্মান বাহিনীকে রুখতে সোভিয়েত জনগণ, জাপ বাহিনীকে রুখতে চীনা জনগণ বা মার্কিন বাহিনীকে রুখতে ভিয়েতনামী জনগণ আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

আজ সমগ্র বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির অনুপস্থিত। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন আজ পুঁজিপতিদের মৃগয়াক্ষেত্র। পুঁজিবাদী সংকট অর্থবিজ্ঞানের নিয়মেই মেটার নয়, চক্রাকারে ফিরে ফিরে আসার পর্যায় আজ স্থায়ীরূপ নিয়েছে। দুনিয়ার বাজার এবং কাঁচামালের উৎসকে পুনর্বাটোয়ার জন্য যুদ্ধ পুঁজিপতিশ্রেণী এড়িয়ে চলতে পারে না। এ যুদ্ধ আঞ্চলিক রূপ থেকে যে কোনো সময়ই বিশ্বযুদ্ধের রূপ গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র, শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ামই নয় এই অস্ত্র ঘোষিতভাবেই রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, ইরান, উত্তর কোরিয়ার হাতে এবং অঘোষিতরূপে আরো অনেক রাষ্ট্রের হাতে। তাই আগামী কোনো যুদ্ধে পরমাণু বোমা ব্যবহার হবে না এমন গ্যারান্টি কেউই দিতে পারে না। দুনিয়ার অন্তত কোনো একটি প্রান্তে শ্রমিকশ্রেণীর পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল এবং তার বিস্তারই এই আসন্ন মহাবিপদের হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করতে পারে।

আমাদের একথা মনে রাখতে হবে পারমাণবিক শক্তি শুধু ধ্বংস আর গণসংহারে ব্যবহার হয় না। সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে এবং মানব কল্যাণে এর বহুবিধ কার্যকারিতা আছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, ক্যানসার সহ বিভিন্ন দুরারোগ্য চিকিৎসা, রোগ নির্ণয়ে, কৃষিক্ষেত্রে, খাদ্য সংরক্ষণে, শিল্প সহ অসংখ্য গঠনমূলক কর্মকান্ডে পারমাণবিক শক্তির বিপুল ভান্ডারকে ব্যবহার করা সম্ভব। পারমাণবিক শক্তিকে তাই অভিশাপ নয়, আশীর্বাদে পরিণত করতে শ্রমিকশ্রেণী তথা ব্যাপক জনগণকে এই শক্তির মালিক হতে হবে। মুনাফাখোরি এবং প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতিশ্রেণীর হাত থেকে পারমাণবিক শক্তি সহ সকল শক্তির ভান্ডারকে কেড়ে নিয়ে তা মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।

শুধুমাত্র পরমাণু বোমা নয়, সমস্ত গণহত্যাকারী অস্ত্রের ভান্ডার যতদিন না পর্যন্ত পুঁজিপতিশ্রেণীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে, প্রতিটি যুদ্ধের অবসান এবং শান্তির সূচনা অসম্ভব।■

●*১৭ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ*

উপেক্ষিত বিজ্ঞানী রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন

সরবরাহ করেন উইলকিনস। নিজেদের তথ্যর সাথে ফ্রাঙ্কলিনের তোলা এক-রে চিত্র (ফোটোগ্রাফ-৫১)-এর উপর ভিত্তি করে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে নেচার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে ওয়াটসন ও ক্রীক দাবি করেন ডিএনএ-র গঠন একটি দ্বি-কুন্ডলাকৃতি পলিমার যেখানে দুটি ডিএনএ একে অপরকে সাপের মত পেঁচিয়ে আছে। ফ্রাঙ্কলিন জানতেও পারলেন না তাঁর গবেষণাপত্রের সাহায্য নিয়ে ঐ প্রবন্ধ তৈরী হয়েছে। নেচার পত্রিকায় ঐ একই সংখ্যায় ফ্রাঙ্কলিন এবং উইলকিনস এর আলাদা আলাদা দুটি সহনিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে ফ্রাঙ্কলিন আরও পাঁচটি গবেষণাপত্র ছাপান।

এরপর রোজালিন্ড কাজ শুরু করেন বারবেক কলেজে। এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি ব্যবহার করে তিনি দেখান টোব্যাকো মোজেক ভাইরাস এর গঠন ফাঁপা নলের মত। শেষ পর্বে তিনি পোলিও ভাইরাসের কাঠামোর উপর কাজ করছিলেন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কারণ তাঁর নিজেরই পোলিও সংক্রামিত হওয়ার ভয় ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এরকম ঝুঁকি নিয়ে গবেষণা বন্ধ হয়। না পোলিও ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যাননি, এক্স-রে-র সাহায্য নিয়ে নিরন্তর গবেষণার অনিবার্য পরিণতি – ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে তিনি মারা যান ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল, মাত্র ৩৮ বছর বয়সে।

এখানেই শেষ নয়। তাঁর মৃত্যুর চার বছর পরে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মরিস উইলকিনস, জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান ডিএনএ-এর কাঠামো আবিষ্কারে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ। বরেণ্য বিজ্ঞানীরা তাঁদের নোবেল বক্তৃতায় একবারও, পরবর্তীতে 'ডার্ক লেডি ও ডিএনএ' নামে বিখ্যাত এবং সবচেয়ে বিতর্কিত ফ্রাঙ্কলিনের নাম উল্লেখ করেননি।■

– শাগুফ্‌তা আলী

রিপোর্ট ঃ

একটি মরনোত্তর দেহদানের ইচ্ছা ও কিছু প্রশ্ন

গত ১৭ই অগাস্ট ২০২১-এ আমাদের 'বিজ্ঞান মনস্ক'র বেহালা-ঠাকুরপুকুর শাখার এক কর্মীর মা রানু চক্রবর্তী ৭২ বছর বয়সে ফুসফুসের সংক্রমণ জনিত কারণে বেহালার একটি বেসরকারি হাসপাতালে রাত ৭.৫০-এ মারা যান। অনেক আগেই তিনি মরনোত্তর দেহদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে যান তার পরিবারবর্গের কাছে। তাঁর মৃত্যুর পর-পরই আমরা দেহদান সংক্রান্ত এনজিও 'গণ-দর্পণ'-এর এক কর্মকর্তা, শ্যামল চ্যাটার্জির সাথে যোগাযোগ করি। উনি জানান এই রাতে দেহ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, বরং এক বেসরকারী মর্গে দেহ সংরক্ষিত রাখা হোক এবং বলেন পরের দিন সকাল বেলায় অফিস খুললে তিনি মেডিকেল কলেজগুলিতে যোগাযোগ করে দেখবেন কোথায় এই দেহ দেওয়া যায়। মৃতার পরিবারের সাথে কথা বলে আমরা তাকে জানাই যে – সমস্ত পরিবার এখন গভীর শোকের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে প্রিয় মানুষের দেহ নিয়ে আরো একদিন ছোটা-ছুটি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্যামল বাবু তখন বলেন যে – এই রকম দেহদান করতে চেয়ে পিছিয়ে যাবার ঘটনার সাথে তিনি বহুল পরিচিত। মাসে দু-তিনটে বডি আসবে বলে মেডিকেল কলেজগুলিতে ২৪ ঘন্টা মৃতদেহ নেবার ব্যবস্থা করা যায় না। মৃতার পরিবারের 'লজিক্যাল' হওয়া উচিৎ। ওনার এই অসংবেদনশীল কথা শুনে আমরা হতবাক! ওনাকে বলি – যে সন্তানরা তাদের মাকে হারিয়েছেন, যে বৃদ্ধ মানুষটি তার ৫০ বছরের জীবন-সঙ্গীনিকে হারিয়েছেন, যে মানুষ জন তাদের আত্মীয়কে, তাদের প্রিয় প্রতিবেশীকে হারিয়েছেন, তাদের পক্ষে কতটা 'লজিক্যাল' হওয়া সম্ভব? আমরা আরো বলি – বিদ্যমান ব্যবস্থায় মানুষকেই সব সময় 'লজিক্যাল' হবার কথা বলা হয়, মানুষকেই দায়ী করার কথা হয়। অথচ মানব সমাজের কল্যাণে ডাক্তারি ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ও মৃতদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজে লাগানোর জন্য মৃতদেহ গ্রহণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় না। এর প্রত্যুত্তরে উনি বলেন – সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি অনেক বেশি জানেন, তাই তাকে যেন বোঝানোর চেষ্টা না করা হয়। আর কথা না বাড়িয়ে ওনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখ দিই।

এরপর চক্ষুদানের জন্য আই-ব্যাঙ্ক-এ যোগাযোগ করি। সেখান থেকে ঘন্টা-খানেকের মধ্যেই দু'জন টেকনিশিয়ান চলে আসেন। কিন্তু এবারে বাধ সাধেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আই-ব্যাঙ্কের ওই কর্মী দু'জন অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেন, অনেক নথিপত্র দেখান, কিন্তু কর্তৃপক্ষ অসহযোগিতা করে তাদের পূর্ব সিদ্ধান্তে বহাল থাকেন। তখন কোন উপায়ান্তর না দেখে ঐ কর্মীরা আমাদের বলেন যে – কর্ণিয়া জনিত কারণে অন্ধের সংখ্যা নেহাত কম নয়। দু'জন অন্ধ মানুষ চোখে দেখতে পাবেন, তাই কর্ণিয়া-টিস্যু দুটি কিছুতেই নষ্ট করা যাবে না। প্রস্তাব দেন যে হাসপাতালের বাইরে এসে শববাহী গাড়ির মধ্যে যদি এই কাজটি করা যায়! পরিবারের লোকজন নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে যায়। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! রাত ১২.৩০ নাগাদ শববাহী গাড়ি ওই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপর দাঁড়ায়। ট্রলিটি ঘুরিয়ে মাথাটি দরজার সামনে আনা হয়। হাসপাতালের সাধারণ কর্মীরা, কিছু পথচারী ছুটে আসেন। ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টির মধ্যে সকলে মোবাইল-এর টর্চ জ্বালেন। সেই আলোয় মাত্র ৭ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে খুব নিপুণ হাতে টেকনিশিয়ানরা কন্টাক লেন্সের মতো দেখতে কর্ণিয়া টিস্যু দুটি তুলে নিয়ে সংরক্ষিত করলেন। অন্তত চক্ষুদান টুকু হলো এই স্বান্তনা নিয়ে শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

গত ২৮শে অগাস্ট রানু চক্রবর্তীর স্মরণে একটি 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' অনুষ্ঠান রাখা হয় সেখানে পরিবার থেকে জানানো হয় যে – দিন কয়েক আগেই ঐ কর্ণিয়া দুটি একটি করে দুটি শিশুর চোখে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং তারা এখন পৃথিবীর আলো দেখতে পাচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় অনুষ্ঠানের শেষে। উপস্থিত মানুষরা বিশেষত বয়স্করা আবেগতাড়িত চোখে বললেন – তাঁদের জন্যও যেন এইরকম ব্যবস্থা করা হয়। তাঁরাও মৃত্যুর পর বেঁচে থাকতে চান অন্য মানুষের মধ্যে।

মরনোত্তর দেহদান, চক্ষুদান সমাজে টিঁকে থাকা অন্ধ-কুসংস্কারের প্রচলিত বহু ভাববাদী ধারণার মূলোচ্ছেদ করে সমাজ প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ উপরের ঘটনাটি আমাদের কি দেখায়? প্রচুর পরিমানে সরকারি অর্থব্যয় করে সরকার ও এনজিও-গুলি মানুষের কাছে মরনোত্তর দেহদানের আবেদন রাখেন। একদল মানুষ সমাজের অন্য মানুষের উপকারের জন্য মরনোত্তর দেহদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অথচ মৃত্যুর পর এই কাজ সম্পন্ন করতে তার আত্মীয়-স্বজনদের চূড়ান্ত হ্যারাসমেন্টের সম্মুখীন হতে হয়। কেন? মেডিকেল কলেজগুলি ২৪ ঘন্টাই মৃতদেহ গ্রহণের কাজ চালু রাখা হয় না। কেন? এই কাজে নিযুক্ত এনজিওগুলি শোকতপ্ত হ্যারাসড পরিবারকে 'লজিক্যাল' হতে পরামর্শ দেন। অথচ মৃতদেহ গ্রহণে সরকারি অব্যবস্থাপনা, উদাসীনতার বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা করেন না। কেন? পরিশেষে এসে পড়ে সেই মোক্ষম প্রশ্ন – সমাজে এখনো কুসংস্কার টিঁকে আছে। কেন? কাদের জন্য?■

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

(সপ্তম পর্ব তৃতীয় অংশ)

গণিত বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অগাস্টিন লুইস কচি-র পদ্ধতি অনুসারে আমরা এবার একই অধিবৃত্ত $y = x^2$ নিচ্ছি এবং তার উপরিস্থ বিন্দু P (2,4) নিচ্ছি, যার উপর স্পর্শকের নতি বা slope নির্ণয় করতে চাই। [চিত্র-৭ (গ)]

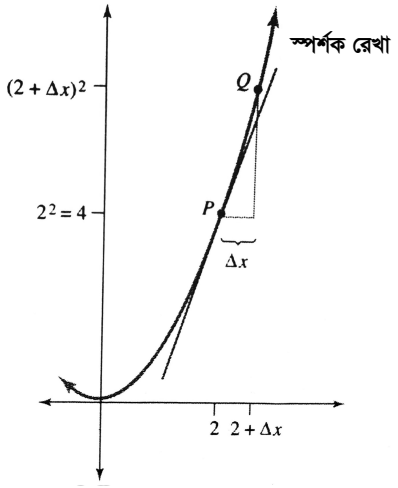

[চিত্র-৭ (গ)]

এই চিত্রে নিউটনের দ্বারা ব্যবহৃত o ('oh') এর স্থলে Δx ব্যবহৃত হল। যেখানে Δx **শূন্য নয় এবং শূন্যমানের দিকে অগ্রসরমান** ধরা হয়েছে।

P বিন্দুতে নতি (slope)

$$= \frac{(2+\triangle x)^2 - 4}{(2+\triangle x) - 2}$$

$$= \frac{\cancel{4} + 4.\triangle x + (\triangle x)^2 - \cancel{4}}{\triangle x}$$

$$= \frac{\triangle x(4+\triangle x)}{\triangle x} = (4+\triangle x)\left[\because \triangle x \neq o\right]$$

এবার Q বিন্দুটিকে যত P এর নিকটবর্তী করা যায় কী ঘটনা হচ্ছে দেখা যাক।

যখন $\Delta x = 1$; Q এর স্থানাঙ্ক $\left(2+1,(2+1)^2\right)$ বা (3,9); স্পর্শকের নতি $4 + 1 = 5$

যখন $\Delta x = 0.5$; Q এর স্থানাঙ্ক $\left(2+0.5,(2+0.5)^2\right)$ বা (2.5, 6.25); স্পর্শকের নতি $4 + 0.5 = 4.5$

যখন $\Delta x = 0.1$; Q এর স্থানাঙ্ক $\left(2+0.1,(2+0.1)^2\right)$ বা (2.1, 4.62); স্পর্শকের নতি $4 + 0.1 = 4.1$

লুইস কচির এই বিশ্লেষণে Q বিন্দুর X স্থানাঙ্ক যত 2 এর কাছাকাছি যাবে (2 পর্যন্ত না পৌঁছে), তত Δx এর মান শূন্য না হয়েও শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছবে। পাশাপাশি PQ এর নতি তত 4 এর সমান না হয়েও তার তত নিকটবর্তী হবে। এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায় হল Δx এর মান শূন্য না হয়েও তার নিকটতম হওয়া। Δx এর মান সে ক্ষেত্রে শূন্য না হয়েও P বিন্দুতে স্পর্শকের নতি (slope) 4 ই হবে। ক্যালকুলাসে একেই লেখা হল $\underset{\triangle x \to 0}{Limit}$ এর সংকেত দ্বারা।

গতিশীল বস্তুর দ্বারা সময়ের সাপেক্ষে অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং

দ্রুতি (speed) নির্ণয় সংক্রান্ত আলোচনাটা করতে গিয়ে অনেকগুলো অন্য বিষয় চলে এসেছে। পাঠকরা হয়তো কিছুটা বিভ্রান্ত হচ্ছেন বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু গতিশীল বস্তুর ঐ ধর্মগুলির পর্যবেক্ষণ এমনই বিক্ষিপ্তভাবেই হয়েছে। গ্যালিলিও-র পরবর্তী আইস্যাক ব্যারো, নিউটন-লিবজিন এর স্পর্শকের নতি নির্ণয় তার সংশোধনকারী লুইস কচির বিশ্লেষণ – এগুলোর সঙ্গে গতিশীল বস্তুর দ্রুতি (speed) (যেমন পতনশীল বস্তুর দ্রুতি)-র সাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক আছে।

কোনো গতিশীল বস্তুর দুইরকম দ্রুতি হয়। প্রথমটা গড় দ্রুতি (average speed)। অন্যটা কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তের দ্রুতি (Instantaneous speed)। এই তাৎক্ষণিক দ্রুতি নির্ণয়টাই গ্যালিলিও থেকে নিউটনের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। একটা উদাহরণ থেকে আলোচনাটা শুরু করা যাক। ধরা যাক এক ড্রাইভার একটি গাড়ি চালিয়ে এক ঘন্টায় ৪৫ মাইল অতিক্রম করলেন, আবার তিন ঘন্টা পর ১৫৫ মাইল অতিক্রম করলেন। চলন্ত গাড়িটির গড় দ্রুতি হবে –

কিন্তু ঐ চলন্ত গাড়ির স্পিডোমিটার যে ৫৫ মাইল / ঘন্টা

$$\frac{\text{দুরত্বের পরিবর্তন}}{\text{সময়ের পরিবর্তন}} = \frac{\triangle d}{\triangle t}$$

$$= \frac{\text{১৫৫ মাইল – ৪৫ মাইল}}{\text{৩ ঘন্টা – ১ ঘন্টা}} = \frac{\text{১১০ মাইল / ঘন্টা = ৫৫ মাইল / ঘন্টা}}{২}$$

দেখাবে, তা নাও হতে পারে। কখনো অনেক বেশি আবার কখনো অনেক কমও দেখাতে পারে। অর্থাৎ গতিশীল গাড়িটির তাৎক্ষণিক দ্রুতি, গড় দ্রুতির সমান নাও হতে পারে। গ্যালিলিও কৃত পতনশীল বস্তুর দ্বিতীয় উদাহরণটি স্মরণ করুন (চিত্র - ৬) [ছবিটি বিগত সংখ্যায় দ্রষ্টব্য]। এইরকম গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রেও গড় দ্রুতি ও তাৎক্ষণিক দ্রুতি সমান নয়। ঐ রকম ক্ষেত্রে কোন পতনশীল বস্তুর দ্বারা অতিক্রান্ত দুরত্ব, অতিক্রান্ত সময়ের বর্গের সমানুপাতিক। গ্যালিলিও-র মৃত্যুর পরে অন্যরা একে বীজগাণিতিক সমীকরণ হিসেবেই দেখেছেন বেশি, যতনা আনুপাতিক সম্পর্ক হিসেবে।

t_1 সময়ে যদি পতনশীল বস্তুটির অতিক্রান্ত দুরত্ব d_1 হয় এবং

t_2 সময়ে যদি পতনশীল বস্তুটির অতিক্রান্ত দুরত্ব d_2 হয়, তবে

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{t_1^2}{t_2^2}$$

গ্যালিলিও-র দ্বারা পেন্ডুলাম ঘড়ি আবিষ্কারের পর তাকে আরো নিখুঁত করলেন ডাচ্ বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হয়গেন্স। এর ফলে উপরিউক্ত বীজগাণিতিক সম্পর্ক যাচাই করার কাজটা আরো ভালো করে করা সম্ভব হল। ফলশ্রুতিতে অতিক্রান্ত দুরত্ব ও সময়ের সম্পর্কটা যা পাওয়া গেল তা হল –

$$\frac{d}{t^2} = 16 \text{ বা } d = 16t^2$$

(যেখানে d = অতিক্রান্ত পতনশীল বস্তুর দুরত্ব ও
t = পতনশীল বস্তুর অতিক্রান্ত সময়)

এই সম্পর্কটি পাওয়ার পর কোনো সময়ে অতিক্রান্ত দুরত্ব এবং গড় দ্রুতি নির্ণয় সম্ভব হল।

কিন্তু গ্যালিলিও বা নিউটন – এঁদের বেশি আগ্রহ ছিল পতনশীল বস্তুটির মত গতিশীল বস্তুর তাৎক্ষণিক দ্রুতি নির্ণয়ে।

যদি পতনশীল বস্তুর প্রাথমিক সময় t হয় এবং Δt সময়ান্তরে তার গড় দ্রুতি নির্ণয় করতে হয়। যেখানে দুরত্বের পরিবর্তন Δd তবে –

কিন্তু তাৎক্ষণিক দ্রুতি = তাৎক্ষণিক সময়ান্তরে গড় দ্রুতি

$$\text{গড় দ্রুতি} = \frac{\text{দুরত্বের পরিবর্তন}}{\text{সময়ের পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{(\text{t} + \Delta t) \text{ সময়ে অতিক্রান্ত দুরত্ব} - \text{t সময়ে অতিক্রান্ত দুরত্ব}}{(\text{t} + \Delta t) - \text{t}}$$

$$= \frac{16(t+\triangle t)^2 - 16t^2}{\triangle t}$$

$$= \frac{\cancel{16t^2} + 16(\triangle t)^2 + 32t\triangle t - \cancel{16t^2}}{\triangle t}$$

$$= \frac{\triangle t(16\triangle t + 32t)}{\triangle t} = (16\triangle t + 32t)\left[\because \triangle t \neq 0\right]$$

অর্থাৎ তাৎক্ষণিক দ্রুতি $= 32t + 16\,\Delta t$
$= 32t$

[যেহেতু Δt অতিক্ষুদ্র হলেও শূন্য নয়, অথচ শূন্যের নিকটতম। তাই $16\,\Delta t$ এর মান সেই পরিস্থিতিতে শূন্য ধরতে হবে।]

লুইস্ কচি কোনো বক্ররেখার উপরিস্থ কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের নতি বার করার সময় Δx কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, এক্ষেত্রেও একই রকম অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে এবং ফল একই রকম হবে।

কোনো বক্ররেখার উপরিস্থিত কোনো বিন্দুতে স্পর্শকের

নতি হোক বা পতনশীল বস্তুর কোনো এক মুহূর্তে তাৎক্ষণিক দ্রুতি – উভয়কেই নিউটন যে সাধারণ রূপে প্রকাশ করলেন তাই অন্তরকলন বা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের ভিত্তি। তিনি দেখালেন যে পরস্পর সমকোণে অবস্থানকারী X–X এবং Y–Y স্থানাঙ্কের অন্তর্বর্তী (অর্থাৎ এই রেফারেন্স ফ্রেমের অন্তর্বর্তী) নিচের লেখচিত্রে যদি একদিকে (চিত্র অনুযায়ী অনুভূমিক অক্ষ বরাবর) স্বাধীন পরিবর্তনশীল চলরাশি বা Independent variable কে আঁকা যায়, অন্য অক্ষ বরাবর তার উপর নির্ভরশীল চলরাশি বা dependent variable কে আঁকা যায়, তবে এদের সমন্বয়ে যে বক্ররেখা বা curve পাবো, তার কোনো এক বিন্দু P (যার স্থানাঙ্ক x, f (x)) তে স্পর্শকের নতি হবে –

$$\underset{\triangle x\to 0}{Limit}\frac{f(x+\triangle x)-f(x)}{\triangle x}$$

[যেখানে $\triangle x$ এর মান শূন্য না হলেও শূন্যের নিকটতম, একে $\underset{\triangle x\to 0}{Limit}$ পরিভাষায় প্রকাশ করা হল।]

নিউটনের ক্যালকুলাস অনুযায়ী একেই ফাংশান f (x) এর

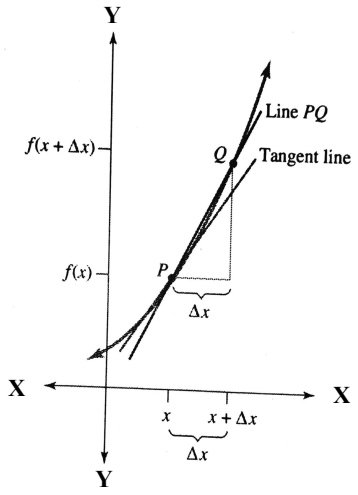

ডেরিভেটিভ বলা হয়, অর্থাৎ ক্যালকুলাসের পরিভাষায় $\frac{df}{dx}$

$$=\underset{\triangle x\to o}{Limit}\frac{f(x+\triangle x)-f(x)}{\triangle x}$$

আমরা এখন গতিশীল বস্তুর সামান্যতম পরিবর্তনের হার (rate of change) নির্ণয় করতে সক্ষম হলাম। এটা পূর্বেকার গণিতের সকল শাখায় সম্পূর্ণত সম্ভবপর ছিল না। এটা ক্যালকুলাসের ধারণাতেই কেবল সম্ভব হল।

আমরা এবার অন্তরকলন বা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের পরিভাষায় পতনশীল বস্তুর অতিক্রান্ত দুরত্ব(d) ও সময় (t) এর মধ্যকার সম্পর্ক থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ $d = 16t^2$ থেকে কোনো তাৎক্ষণিক মুহূর্তে দ্রুতি (**instantanous speed**) নির্ণয় করবো।

যদি $d = 16t^2 = f(t)$ বা t এর ফাংশান হয় তবে তার তাৎক্ষণিক দ্রুতি

$$=\frac{dd}{dt}=\underset{\triangle t\to 0}{Limit}\frac{f(t+\triangle t)-f(t)}{\triangle t}$$

$$=\underset{\triangle t\to 0}{Limit}\frac{16(t+\triangle t)^2-16t^2}{\triangle t}$$

$$=\underset{\triangle t\to 0}{Limit}\frac{\cancel{16t^2}+32t\triangle t+(\triangle t)^2-\cancel{16t^2}}{\triangle t}$$

$$=\underset{\triangle t\to 0}{Limit}\frac{(\cancel{\triangle t})(32t+\triangle t)}{(\cancel{\triangle t})}\begin{bmatrix}\because \triangle t\to 0\\ \therefore \triangle t\neq 0\end{bmatrix}$$

$$==\underset{\triangle t\to 0}{Limit}\ (32t+\triangle t)$$

$$=32t+0=32t$$

এই রকম সমস্ত প্রকার পরিবর্তনের হার (যার অনেক উদাহরণ আমরা বিগত অধ্যায়গুলোতে দিয়ে এসেছি)। তা সঠিকভাবে নির্ণয় সম্ভব হল। স্বাধীন চলরাশির ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনের হার নির্ণয় আগে সম্ভব ছিল না।

এখানে স্বাধীন চলরাশি t এর ক্ষুদ্রতম পরিবর্তন $\triangle t\to 0$ দ্বারা নির্দেশিত। এর অর্থ সময়ের পরিবর্তনটা সীমাহীন ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র যে তার মান শূন্যের দিকে কমতে কমতে সেই ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনকালে তাকে শূন্যই ধরতে হবে। যদিও তা শূন্য নয়।

একই সঙ্গে শূন্য (অর্থাৎ কোনো কিছু নেই) আবার শূন্য নয় (যার অস্তিত্ব আছে) এই দুই বিপরীতের ঐক্য বস্তুজগতের সবকিছুরই অনাদিকালের নিয়ম।

কোনো বস্তুর পরিবর্তনটা কোনো নির্দিষ্ট অভিমুখে যখন হয়, তখন চূড়ান্ত বিন্দুতে (ঐ ঘটনার চূড়ান্ত বিন্দু বলা হচ্ছে) পৌছবার আগে পর্যন্ত বস্তুটিকে সেই চূড়ান্তরূপের সমার্থক বলা চলে না। যখন সেই চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছায়, তখন এই দুই বিপরীতের সম্মুখীন হতে হয়। পরিবর্তনশীল বস্তুর প্রতিটি মুহূর্তেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। $\triangle t\to 0$ এর পরিবর্তে $\triangle t\to m$ (m একটির স্থির সংখ্যা) – লিখলেও একই ধরনের বৈপরীত্যের সম্মুখীন হব আমরা। (ক্রমশ)

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবন্ধ ঃ

লক ডাউনে কেমন আছি

[আমাদের সংগঠনের উদ্যোগে শিশু-কিশোর ও উচ্চশিক্ষায় পাঠরতদের কাছে প্রবন্ধ লেখার আবেদন রাখা হয়েছিল। এটা কোনো প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশু থেকে যুবকদের মনের কথা জানা। তিনটি বিভাগ করা হয়েছিল অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত বিভাগের বিষয় ছিল 'লকডাউনে কেমন আছি'। নবম থেকে দ্বাদশশ্রেণীতে পাঠরতদের জন্য বিষয় ছিল 'অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আমার মত'। কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত বিষয় ছিল 'ইউজিসি-র সিদ্ধান্ত-উচ্চশিক্ষায় অনলাইন শিক্ষা (ব্লেন্ডেড লার্নিং)'। এই তিন বিষয়ে বাংলা ও ইংরাজীতে প্রবন্ধ লেখার আহ্বান রাখা হয়। আমরা সমীক্ষণের এই সংখ্যায় অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত প্রবন্ধগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করছি। পরবর্তী সংখ্যায় বাকি বিভাগের লেখাগুলো প্রকাশিত হবে।

–সম্পাদক, সমীক্ষণ]

১. দীপেন্দু দাস, পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর, বাবুগ্রাম

২৪শে মার্চ ২০২০, ভারত সরকার কোভিড-১৯-এর জন্য লকডাউন ঘোষণা করে। দোকান-হাট-বাজার, স্কুল, গাড়ি সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণে গৃহবন্দি হয়ে পড়ি। ঘরের টিউশনও বন্ধ হয়ে যায়।...

লকডাউনের আগের মতো স্কুলে যেতে না হওয়ায় প্রথম দু-চার মাস বেশ মজা ছিল, কিন্তু তারপরেই ঘরে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেলাম। ... ছাদে উঠে দেখি যে রোডে সব সময়ে গাড়ি চলাচল করতো, এখন তা ফাঁকা। শুধু এম্বুলেন্স আর পুলিশের গাড়ি চলছে। বাস-ট্রেন, দু-চাকা, চার চাকা বন্ধ, কিন্তু মালগাড়ি, লরি, এমনকী কারখানাও চলছে। তা হলে লকডাউন কী করে হল? এটা আমি জানতে পেরেছি ছাদে উঠে। দেখি আমাদের দক্ষিণের রেললাইনে শুধু মালগাড়ি, আর কোনো ট্রেন নেই। উত্তরে ডিভিসি কোম্পানির কারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, মানে সেখানে কাজ চলছে। বাড়ির সামনের রোডে লরি বাদ দিয়ে আর কোনো গাড়ি নেই।

আমি টিভি বা মোবাইল ফোন দেখতাম। সেটাও ভালো করে পেতাম না। ঘরের বড়রা বলতো শুধু 'পড় আর পড়'। আর আমার অল্প পড়তেও ভালো লাগে না। তবে এই লকডাউনে একটা মজা ছিল, আমরা সবাই ঘরে একসাথে ছিলাম। ... লকডাউনের জন্য প্রথম আমি আমার স্কুল, ক্লাসের অভাব অনুভব করি। পড়াশুনোর জন্য অনেক জায়গায়ই অনলাইন ক্লাস হচ্ছে। কিন্তু আমার ক্লাস হয়নি। আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের হয়েছে। বাবা বললেন, "আমাদের এখানে ইন্টারনেট ব্যবস্থা অত ভালো নেই।"

এই লকডাউনে আমি কার্ডবোর্ড দিয়ে প্রচুর জিনিস বানিয়েছিলাম। টিভি ও মোবাইলে বলতো সবসময় হাত ধুয়ে সাবান বা সেনিটাইজার দিয়ে ও খুব দরকার ছাড়া বাইরে না বেরোতে। আমি দিনে ২০ বার হাত ধুতাম। একদিন মোবাইল দেখে বিস্কুট দিয়ে প্রথম কেক বানালাম।

লকডাউনে প্রচুর মানুষ না খেয়ে মারা যায়, অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকরা সেখানে আটকে পরে, তারা হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে। অনেকে ফেরার পথে মারাও গেছেন। এই খবরটি শুনে আমি প্রচুর দুঃখ পেলাম। তার এক বছর পরই আবিষ্কার হল কোভিড-১৯-এর ভ্যাকসিন। আমি খবরটা শুনে প্রচুর আনন্দিত হলাম। সবাইকে ভ্যাকসিনেসন করলে কোভিড নামে রোগ থাকবে না। পরে জানলাম এই ভ্যাকসিনটি শুধু বড়রাই নিতে পারবেন। ছোটদের জন্য ভ্যাকসিনই নেই।

এবার খুলছে লকডাউন। আবার সব খুলে যাবে। ছাদে উঠে দেখি ফাঁকা রোডে আবার বাস, অটো, গাড়ি ও মানুষজন। বাসগুলোতে আগের চেয়েও বেশি ভিড়। সব খুলে গেল। কিন্তু স্কুল খুললো না। বলে নাকি স্কুলে বেশি ভিড় হয়। তাহলে রেস্টুরেন্ট, হোটেল, সিনেমা হল এগুলোতে কী কম ভিড় হয়? তাহলে স্কুল খুলছে না কেন?

এই সব নিয়ে আমার লকডাউন কেটেছে আনন্দ, দুঃখ, রাগ, প্রশ্ন নিয়ে।

২. আরুষী মতিলাল, ষষ্ঠ শ্রেণী
শাউ পাবলিক স্কুল, কলকাতা

গত ২ বছরে আমার কাছে সবাই নতুন – করোনা, লকডাউন – জীবনে নাম শুনিনি এদের। কোথাও যেতে পারছি না এই লকডাউনের জন্য। সবসময় ঘরে বসে থাকতে আর কার ভালো লাগে? স্কুল যাওয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন অনলাইনে ক্লাস করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে আমার অনলাইন ক্লাস করতে ভালো লাগে না। অঙ্ক আর কেমিস্ট্রি বুঝতে যা অসুবিধে হয় সে কি আর ওই পাজি করোনা বুঝবে? আমার তো মনে হয় 'লকডাউনে কেমন আছি?' এই রচনার নিচে বড়ো বড়ো করে

লিখে দি 'ভালো নেই'।

সে যাই-ই হোক, এখন সবকিছু মোটামুটি অনলাইন হয়ে গিয়েছে। ছোট-ছোট বিষয়ে খুব রেগে যেতাম, মানে করোনার প্রতি যা রাগ ছিল সেইগুলো আর জমিয়ে রাখতে পারতাম না। কিন্তু পরে আমি ভাবলাম যে সবসময় কি লকডাউনের উপর রাগ করলে চলবে? তাই আমি অনেক কিছু শিখেছি যেমন কম্পিউটারে Scratch Programming করা ভালো গান গাওয়া, ভালো ছবি আঁকা, ডিটেকটিভ গল্প লেখা, গল্পের বই পড়া, টুক-টাক গল্প বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দিতে লেখা।

যখন আমার আগ্রহ এই বিষয়গুলোর প্রতি বাড়তে শুরু করল তখন ধীরে ধীরে আমার রাগ কমতে শুরু করল। যদিও এতদিন ধরে আমার লকডাউনে থাকতে ভালো লাগছে না কারণ বন্ধুদের সাথে দেখা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু নতুন বাড়িতে আসার পর আমি বেশ কয়েকটা কুকুর-বিড়াল পেয়েছি, তাই জন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না হওয়ার কষ্টটা কিছুটা হলেও কম হয়েছে তবুও সবসময় করোনা, লকডাউন এদের নিয়ে চিন্তা করলে হয়? তাই জন্য আমি ঘরে বসে প্রায় অনেক কিছু শিখছি। এই কষ্টদায়ক লকডাউনেও ভালো থাকার যে চেষ্টা করে চলেছি সেটাই হল আমার আসল অভিজ্ঞতা।

৩. রনি পাল, ষষ্ঠ শ্রেণী, কলকাতা

প্রথম ২৪শে মার্চ, ২০২০ ভারতে লকডাউন হলো। সমস্ত গাড়ি, বাস, ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল। যারা বাইরে গেছিল তারা বাড়ি ফিরতে পারেনি। তাদের পরিবারের লোক কাঁদছিল। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তারা কি খাবে, কি করবে – কিছুই ঠিক নেই। যাঁদের ঘরে অসুস্থ বুড়ো বাবা-মা আছেন, তাঁদের আরো অসুবিধা হল। ... চারিদিকে হাহাকার। করোনায় কত মানুষের প্রাণ চলে যাচ্ছে। অনেক অসুস্থরা হাসপাতালে যেতে গাড়ি পাচ্ছে না। আবার অনেক হাসপাতালে বেডের অভাব। এক কথায় জীবন-মরণ সমস্যা। এমন অবস্থায় ডাক্তার-নার্সরা দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে মানুষের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। ... শুধু ডাক্তার-নার্স নন পুলিশ, ডেলিভারিবয় সহ আরো অনেকেই এমন অবস্থায় সাধারণ মানুষের পাশে ছিলেন।

এমন পরিস্থিতিতে ঘরে বসে, কখনো পড়াশুনো করে, কখনো টিভি-মোবাইল দেখে সময় কাটাতে হয়েছে। মনে হচ্ছিল – এভাবে আর কত দিন! টানা দুই বছর ধরে লকডাউন চলছে, আর ভালো লাগছে না। বন্ধুদের কথা, স্কুলের কথা, বিকেলের খেলা – এসব মনে পড়ছে। তাই রাতে ঘুমও আসে না। ...

বাবা-মা সকাল হলেই দোকানে কাজে চলে যান। ... অনলাইনে পড়াটা তেমন বুঝতে পারি না। এমন পরিস্থিতিতে মনে হয় স্কুলটা খুলে দিলেই ভালো হত।

একদিন হঠাৎ গ্রাম থেকে বড়ো মামার হাত ভাঙার খবর আসে। খবর পেয়ে বাবা-মা-ভাই আর আমি গ্রামে চলে যাই উবের বুক করে। আমাদের গ্রামের নাম হাতিশাল। এটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কেশপাই অঞ্চলে। গ্রামে গিয়ে দেখলাম, সেখানকার লোকজনের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। ... মাঠের ধান, চাল, ডাল, তেল দিয়ে খাওয়াটা হয় কোনো রকমে। শুধু খাওয়া হলে কী চলে? ... লকডাউনে বাজার-হাট বন্ধ, কোথা থেকে টাকা আসবে। ইলেকট্রিক বিল, ধান ভাঙানো ও আরো অনেক কাজে তো টাকা লাগে। ... স্কুল বন্ধ বলে ছোট ছোট বাচ্চারা মাঠের কাজে লেগে যাচ্ছে। ... এতে বাচ্চাদের পড়াতে আর মন নেই।

আবার চাষও ভালো হচ্ছে না। তার ওপরে হঠাৎ ইয়াস নামে এক ঘূর্ণিঝড় এসে সবকিছু বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে গেল। ঘরের জিনিসপত্র বন্যায় ভেসে গেল। এরকম অবস্থায় ঘরে খাবার মত কিছু নেই। মামার হাতের চিকিৎসার জন্য কটক যেতে হবে। বাবা, ছোট মামা ও দাদু বড়ো মামাকে এমবুলেন্স করে কটকে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় আমার মাসি, দিদা, মা সবাই কান্না করছিল। ... তারপর কী হলো, সেটা আমি জানি না, কারণ আমিতো যাইনি। আমাকে যতটুকু বলেছিল, আমি ততটুকু জানি। তারপর হয়তো আরো অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। যাইহোক, অপারেশনের পর মামা ঘরে ফিরে এলো। মামা ওষুধের দোকানে কাজ করত। হাত ভাঙার কারণে আর কাজে যেতে পারেনি। দাদু মাঠে চাষ করতো, আর ছোটো মামা ফুলের কাজ। তার কাজ বন্ধ থাকায় সেও দাদুর সঙ্গে কাজ করতো। কিছুদিন গ্রামে থেকে আবার আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম।

এখন বাবার দোকানে তেমন একটা ভিড় না হলেও বাবা আমাদের খাওয়া পড়ার কোনো অভাব রাখেনি। বাবা-মায়ের যতই কষ্ট হোক, আমাদের কষ্ট যাতে না হয়, তারা তাই চেষ্টা করেন।

৪. প্রতীতি বিশ্বাস, ষষ্ঠ শ্রেণী

নব ব্যারাকপুর কলোনি গার্লস হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগণা

'লকডাউন' এই শব্দটা আমার কাছে পুরোপুরি নতুন। আশা করি, প্রায় সবার কাছেই এটা নতুন শব্দ। এই কোভিড-১৯ সবার জীবনেই প্রায় তালা দিয়ে রেখেছে। স্কুল, টিউশন সব বন্ধ। যদি আমায় কোনো সময় প্রশ্ন করা হয় যে, আমি লকডাউনে কেমন আছি, আমার উত্তর হবে, "আমি ভালো নেই"। কেই বা ভালো থাকতে পারে? স্কুল চলছে না, চললেও সেটা নাকি আবার 'অনলাইন'। আমার তো বেশিরভাগ দিনই ক্লাস করা হয় না। খাতাও লেখায় খুব একটা ভরেনি। কিন্তু

করবো কি?

লকডাউনে একটা শব্দ প্রচলিত হয়ে গেছে সেটি হলো 'মৃত্যু', আরো এরকম শব্দ আছে। যেমন – 'সংক্রমণ', 'আক্রান্ত' ইত্যাদি। তাছাড়া, আমার মাস্ক পড়তে একদমই ভালো লাগে না, কিন্তু কি করা যাবে ... বেরোতে হয় মাস্ক পরে। সঙ্গে রাখতে হয় স্যানেটাইজার।

এসব ছাড়া আমার লকডাউন ভালো কেটেছে। তার কারণ, এই পাঠপুস্তক-এর মাঝখানেই যে বইগুলোয় ধুলো জমে গেছিলো মানে 'গল্পের বই' – ওই বইগুলোতে কতদিন পর হাত দিলাম। পড়লাম সেগুলো। ভালো লাগলো। তারপর আঁকলাম, খেলাধুলোও হলো। পড়াশোনা করতে হলোনা খুব একটা। না পড়েই পাশ।

আর দরকার লাগে না রবিবারের অপেক্ষা করতে; করতে হয় না অপেক্ষা পুজোর ছুটির। কারণ, এখন তো প্রতিদিনই ছুটি।

যাই হোক, যাবে এই করোনা, যেতেই হবে, আর তার অপেক্ষায় আমরা ...

৫. শ্রেয়শী গড়াই, ষষ্ঠ শ্রেণী, পুরুলিয়া

In the year 2020, for the fast time I experienced lockdown. On 23rd of March, the lockdown began I was very confused that what shall I do the whole day. I thought I should try something new, something I have not done before. So taking out my new art kit, I tried to make painting with acrilic colours. I also started to make many types of crafts. But still I was having a lot of spare time. After a few days I was very happy to hear that my school is starting online classes from 8th June. I thougth that the teachers and friends I have not seen since a long time, atleast I will be able to see them using phone. And as my brothers were not having online classes so I started to tcach them. ... Then on 23rd June father bought a laptop for me, that was a wonderful moment for me. ... I am enjoying lockdown but I am missing my school and friends very badly and I hope the lockdown ends soon.

৬. সুস্মিতা পাত্র, ষষ্ঠ শ্রেণী, বড়িশা গার্লস হাইস্কুল কলকাতা

প্রথম ২৪শে মার্চ লকডাউন হয়। সব গাড়ি, বাস, ট্রেন বন্ধ হয়ে যায় এবং সব স্কুলও বন্ধ হয়ে যায়। ... ঘরে বসে অনলাইন ক্লাস, একদম ভালো লাগছিল না, মন খারাপ হচ্ছিল স্কুলের বন্ধুদের জন্য। কোথাও ঘুরতে যেতে পারছি না, এক সপ্তাহ টিভি দেখে কাটিয়ে দিলাম।

ওদিকে বাবার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তার মধ্যে আমার ঠাকুমা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ঠাকুমার চিকিৎসায় অনেক খরচ হল।

তারপর আস্তে আস্তে দোকান পাট খুলতে শুরু করল। প্রথমে পাড়ার মুদিখানা দোকানগুলি তারপর বাজার, তারপর গাড়ি-ঘোড়া এবং ট্রেন ইত্যাদি খুললো। একদিন হঠাৎ আমার মেসোর অসুস্থতার ফোন এল। আমরা সেদিন বেড়িয়ে পড়লাম মেসোর বাড়ি যাবো বলে। রাস্তায় দেখলাম মাত্র দু-তিনটে গাড়ি চলছে। মেসো চিকিৎসার পর সুস্থ হলে আমরা বাড়ি চলে এলাম। ... একদিন রাতে বাবা টিভিতে দেখলেন সবাইকে ভ্যাকসিন নিতে বলছে। বাবা মাকে বললেন আমরা সবাই ভ্যাকসিন নেবো। ঠিক তার দু-তিন সপ্তাহ পর আমার মা ও বাবা ভ্যাকসিন নিয়ে নিলেন। তারপর পুরোপুরিভাবে লকডাউন খুলে গেল। ...

৭. সৃজিতা বিশ্বাস, পঞ্চম শ্রেণী, কলকাতা

২২শে মার্চ ২০২০ হঠাৎ স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে লকডাউন ঘোষণা করা হল। ... লকডাউনের সময় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ দাস দামোদর মোদী সর্বত্র আমাদের অভিভাবকের ভূমিকায় অভয় জুগিয়ে গেছেন এবং আমাদের ... উৎসাহ দিয়ে গেছেন। এছাড়াও আমাদের পাশে ছিলেন ডাক্তার, নার্স, আয়া, কেএমসি ও পুলিশ কর্মীরা।

এবার আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরছি। প্রথমেই আমার স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। ... সহপাঠিদের সঙ্গে আগের মতো একসঙ্গে লেখাপড়া করতে পারি না। এখন শুধু অনলাইনের ক্লাস ... ঘরে বসে আর সময় কাটে না, ... শুধু অপেক্ষায় বসে থাকি কবে আবার স্কুল খোলার সংবাদ পাবো। ...

৮. শ্রীজিতা মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণী, কলকাতা

After the comming of corona virus, lockdown have become very common in our life ... all bus and train were closed. My father is a doctor. He was not going to see paitent at Maniktala ...

I miss my school ... I want to play with freinds and to share food, study tohether.

... In lockdown I get time ... But I wish school open fast. ■

ঃ বিজ্ঞানের খবর ঃ

জানুয়ারী, ২০২১

৪. * মোটর নিউরোন রোগের কারণে যে স্নায়ু কোষের ক্ষতি হয় তা সারিয়ে তুলে পুনরায় প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় কিভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব তা গবেষকেরা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। সম্প্রতি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিদ্যা বিভাগের একদল গবেষক জানিয়েছেন যে মাইটোকন্ড্রিয়া হ'ল কোষের 'শক্তিঘর', মোটর নিউরোন রোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোষের ভিতরে অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ঐ নিউরোনকে সারিয়ে তোলা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এটা সম্ভব হলে আগামীদিনে স্নায়ু চিকিৎসার এক গুরুত্বপূর্ণ দিগন্ত উন্মোচিত হবে।(বিবিসি নিউজ)

৬. * এই প্রথমবার বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে একটি বিশ্বব্যাপী পর্যালোচনা প্রকাশ করেছেন। এই পর্যালোচনায় বর্জ্য পদার্থের সঠিক ব্যবস্থাপনা, মনুষ্য জীবন ও জনস্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব, অতীতের ত্রুটি সংশোধন, প্রযুক্তিগত সমাধান, আগামীদিনে এই বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখানো হয়েছে, সারা বিশ্বে বছরে প্রায় ১০০ কোটি টন পুর-বর্জ্য ভুল ব্যবস্থাপনার জন্য সংগৃহীত হয়না ও যার অধিকাংশটাই যত্রতত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়। ফলে বায়ুতে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থাপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য উৎকৃষ্ট গবেষণার প্রয়োজন, কিন্তু ইদানিংকালে তহবিলের অভাবে এই গবেষণা ব্যহত হচ্ছে। (উইকিপিডিয়া)

৮. * এক প্রতিবেদনে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে তাঁরা সবচেয়ে দূরবর্তী, প্রবীণতম ও মহাকাশের উজ্জ্বলতম কোয়াসারটি আবিস্কার করেছেন। কোয়াসারটি ১৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ও বিগ ব্যাং এর প্রায় ৬৭০ মিলিয়ন বছর পর আবির্ভূত হয়। কোয়াসারটি আকাশ গঙ্গার তুলনায় প্রায় এক হাজারগুণ ও সূর্যের তুলনায় দশ ট্রিলিয়ন গুণ উজ্জ্বল। (আমেরিকান এস্ট্রোফিজিক্যাল সোসাইটি)

***** সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদেরা জানিয়েছেন যে, আফ্রিকার সাংস্কৃতিক যুগ যা 'মধ্য প্রস্তর যুগ' বলে পরিচিত, ৩ লক্ষ থেকে ৩০ হাজার বছর পর্যন্ত টিকে ছিল। কোন কোন জায়গায় তা ১১ হাজার বছর আগেও টিঁকে ছিল বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুমান। (সাইয়েন্টিফিক রিপোর্টস)

***** সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২০০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত পরীক্ষা করে বিশ্বের ১৩টি গবেষণা সংস্থার মোট ২০ জন গবেষকের একটি দল জানিয়েছেন যে এই বছর অর্থাৎ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সমুদ্র জলের উষ্ণতা ইদানিংকালের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে বিজ্ঞানীরা এই তথ্যটি প্রকাশ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে, **অতিমারির কারণে সারা বিশ্বে আংশিক বা সম্পূর্ণ লক ডাউন থাকার জন্য বাতাসে কার্বন নিষ্ক্রমণের পরিমাণ ছিল স্বাভাবিক ভাবে অনেক কম। তা সত্ত্বেও সমুদ্রের জলের উষ্ণতা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে।** (চাইনিজ একাডেমী অফ সায়েন্স)

***** সম্প্রতি মধ্য ইজরায়েলের এক অঞ্চলে খনন কার্য হতে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কিছু বিশেষ ধরনের হাড় আবিস্কার করেছেন। সেগুলি পরীক্ষা করে তাঁরা জানিয়েছেন যে তাদের প্রাপ্ত হাড়গুলি আদিম মানুষেরা সংকেত আদান প্রদানের জন্য ব্যবহার করত। হাড়গুলি প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার বছর পুরানো। হাড়গুলির উপর বিশেষ ধরণের খোদাই কার্য পরীক্ষা করে গবেষকদের ধারণা এই খোদাইগুলি মনুষ্য কীর্তি যা বিশেষ ধরনের ছুঁচালো প্রস্তর খন্ড দ্বারাই করা সম্ভব। (হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়, ইজরায়েল)

২৬. * কোন বদ্ধ জায়গায় এক সাথে অনেক মানুষের উপস্থিতিতে বায়ু বাহিত জীবাণুর পরিমাণ বেশি হয় সে তো সকলেই জানেন। ইদানিং, একটি পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে বদ্ধ স্থানে বাতাস পরিশোধক বা ভেন্টিলেটর যন্ত্র ব্যবহার করলে বায়ু বাহিত জীবাণুর সঞ্চালনের হার বৃদ্ধি পায়। (আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব ফিজিক্স)

২৮. * এক প্রতিবেদনে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেণ যে, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের কারণে বিশ্ব জুড়ে লক ডাউন পর্যায়ে তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে বায়ু দূষণের মাত্রা হ্রাস পাবে এবং পৃথিবীর বায়ুমন্ডল শীতল হবে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলাফল জানাচ্ছে যে লক ডাউন পর্যায়ে বাতাসে কার্বন নিষ্ক্রমণের পরিমাণ হ্রাস পেলেও, উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ঘটনার ব্যাখ্যা হিসাবে তাঁরা জানিয়েছেন যে,**কল-কারখানা, মোটর গাড়ি ইত্যাদি বন্ধ থাকার কারণে বাতাসে এরোসলে-র মাত্রার হ্রাস ঘটেছে। এই এরোসল কণাগুলি (ব্ল্যাক কার্বন, সালফেট, নাইট্রেট, ধুলিকণা ইত্যাদি) বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থেকে সূর্যের তাপ বিকিরণ করে তা মহাকাশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু লক ডাউনের পর্যায়ে এরোসলের অনুপস্থিতিতে সূর্যের তাপ বেশি পরিমাণে পৃথিবীপৃষ্ঠে এসেছে তাই এই উষ্ণতা বৃদ্ধি।** (এনসিএআর)

ফেব্রুয়ারী ঃ ৫. * সৌরজগত বহির্ভূত প্রথম মহাজাগতিক বস্তু 'ওউমুয়ামুয়া'-র রহস্য ভেদের লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা আরও এক ধাপ এগোলেন। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে মহাজাগতিক বস্তুটি প্লুটো বা কুইপার বেল্টে ঘূর্ণায়মান বস্তু মন্ডলীর মতো নাইট্রোজেন বরফ দ্বারা গঠিত হবার সম্ভাবনা প্রবল। স্মরণ করা যেতে পারে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে এই অদ্ভুত মহাজাগতিক বস্তুটি হঠাৎই আমাদের সৌর জগতে প্রবেশ ক'রে। বিজ্ঞানীদের এক অংশ মনে করেন যে এটি সৌর জগতের বাইরের কোন নক্ষত্রজগত থেকে আগত কোন বস্তু। (সায়েন্স)

৮. * বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে প্রাণের সম্ভাব্য অস্তিত্ব পরীক্ষা করার জন্য তাঁরা যথাক্রমে ফসফিন ও মিথেন গ্যাসকে বিবেচনা করেছেন। **বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে প্রাণ সৃষ্টির জন্য কেবল জলীয় মাধ্যমের প্রয়োজন এমন নয়, ফসফিন বা মিথেন দ্বারাও তা সম্ভব।** (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১০. * চীনা মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে তাঁরা চীনা মহাকাশযান তিনাওয়েন-১ কে সফলভাবে মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছেন। (লাইফ সায়েন্স ডট কম)

১৫. * আজ থেকে আনুমানিক ৬৬ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী থেকে ডাইনোসর-এর বিলুপ্ত হবার কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা গ্রহাণু-পৃথিবী সংঘাতকে দায়ী করে এসেছেন। সম্প্রতি, বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন ধূমকেতু থেকে ছিন্ন হয়ে যাওয়া বড় বড় টুকরো পৃথিবীতে আছড়ে পরার কারণেই ডাইনোসরেরা বিলুপ্ত হয়েছে। যদিও বিজ্ঞানীদের এক বড় অংশ এখনও পূর্ব ধারণা পোষণ করেন। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১৮. * আমেরিকান গবেষণা সংস্থা নাসা-র ২০২০ মঙ্গল অভিযানের জন্য নির্মিত মহাকাশযান প্রায় সাত মাসের সফর শেষে মঙ্গলে অবতরণ করেছে। এতে একটি রোভার ও একটি হেলিকপ্টার রয়েছে। (নাসা)

***** মহাকাশ বিজ্ঞানীরা একটি প্রতিবেদনে আকাশ গঙ্গা ছায়াপথে অবস্থিত একটি কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধানের কথা জানিয়েছেন। সিগনাস এক্স-১ নামের কৃষ্ণ গহ্বরটি ২১টি পৃথিবীর ভরের সমান। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে এতে দৈত্যাকার গ্রহের বিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণার এক দিগন্ত উন্মোচিত হল। (সায়েন্স)

১৯. * ভূচৌম্বকীয় ধর্মের পরিবর্তন ও তার প্রভাব সম্বন্ধীয় একটি চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন বিজ্ঞানীদের কাছে কোন নতুন ঘটনা নয়। ৪২০০০ বছর আগে পৃথিবীর ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, যাকে **'ল্যাসচ্যাম্প ইভেন্ট'** বলা হয়। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন ভূচৌম্বকত্বের পরিবর্তন পৃথিবীর বুকে ব্যাপক ভৌগলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। **নিয়ান্ডারথ্যাল প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার অন্যতম কারণ হল এই ভূচৌম্বকত্বের পরিবর্তন। ৪০ হাজার বছর আগেও এই প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল।** (সায়েন্স)

২২. * মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এই প্রথম উত্তর মহাজাগতিক অর্ধগোলকে অবস্থিত প্রায় ২৫০০০টি কৃষ্ণ গহ্বর সম্বলিত একটি হাই রিজলিউশন ম্যাপ প্রকাশ করেছেন। (সায়েন্স অ্যালার্ট)

মার্চ ঃ ১. * বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের যকৃতে লিপিড ন্যানো কণা ব্যবহার করে ও সেটিকে CRISPR জিনোম সংশোধনের মাধ্যমে কোলেস্টেরলের মাত্রা ৫৭% হ্রাস করা সম্ভবপর করেছেন।

৩. * অ্যাজোএমিকাস সিলিয়াটিকোলা নামক একধরনের পরজীবী ব্যাক্টিরিয়া আবিস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন বিজ্ঞানীরা। পোষক কোষে অবস্থান করা সিলিয়া যুক্ত ব্যাক্টিরিয়া এটি।

৮. * বর্তমান পৃথিবীর জীবমন্ডলে মোট প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। এর মধ্যে উদ্ভিদ, প্রাণী ও ছত্রাক মিলে মোট ৬৭ লক্ষ। প্রকৃতি স্বাভাবিক নিয়মেই এদের অনেকের অস্তিত্ব জীবমন্ডল থেকে হারিয়ে যাচ্ছে চিরতরে, আবার নতুন সদস্যের আবির্ভাব ঘটছে অবিরত। পৃথিবীর জীব বৈচিত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে বিজ্ঞানীরা ৬৭ লক্ষ প্রজাতির জিন সংরক্ষণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। জিনের এই সুবিশাল মহাফেজখানা কোথায় বানানো হবে? বিজ্ঞানীরা প্রস্তাব দিয়েছেন যে চাঁদের বুকে রাখা যেতে পারে এমন সিন্দুক, যার নাম রাখা হবে, 'লুনার আর্ক'। (লাইফ সায়েন্স)

১৬. * আন্তর্জাতিক মহাকাশ ষ্টেশনে গবেষণায় বিজ্ঞানীরা একটি অজানা ব্যাকটিরিয়ার অস্তিত্ব জানতে পেরেছেন। এই নব আবিস্কৃত ব্যাকটিরিয়াটির নাম মিথাইলো ব্যাকটিরিয়াম। এখনো পর্যন্ত ব্যাকটিরিয়াটির তিনটি ষ্ট্রেন আবিস্কৃত হয়েছে। (সায়েন্স এলার্ট)

***** সৌরজগৎ বহির্ভূত মহাজাগতিক বস্তু 'ওমুয়ামুয়া' যে প্লুটোর মতো কোন গ্রহের অংশ তার স্বপক্ষে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ দাখিল করেছেন। (জিওফিজিক্যাল জার্নাল প্ল্যানেট)

১৯. * আমেরিকান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে যে মঙ্গল গ্রহের গুরুমন্ডল ১৮১০ কিমি. থেকে ১৮৬০ কিমি. – পর্যন্ত বিস্তৃত। মঙ্গল গ্রহে প্রেরিত 'ইনসাইট' নামক ল্যান্ডার মঙ্গল পৃষ্ঠের প্রায় ৫০০টি কম্পন পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। মঙ্গলের গুরুমন্ডলের আয়তন পৃথিবীর তুলনায় প্রায় অর্দ্ধেক। (নাসা)

২৩. * আমেরিকান সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছে, এতকাল পর্যন্ত পৃথিবীর আকাশে যে সমস্ত ইউএফও বা অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি সংকলিত করে একটি প্রতিবেদন

প্রস্তুত করতে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন প্রয়াস এই প্রথম।

২৬. * পৃথিবীর সঙ্গে ৯৯৯৪২ অ্যাপোফিস নামক একটি গ্রহাণুর সংঘর্ষের সম্ভাবনাকে নাকচ করেছে নাসা। গ্রহাণুটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে কিছু বিজ্ঞানী এমনটা অনুমান করেছিলেন। সম্প্রতি নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে আগামী এক শত বছরেও এমন সম্ভাবনা নেই। (নাসা)

৩১. * ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এই প্রথমবার একটি অনিয়াতাকার কঠিন পদার্থের ত্রিমাত্রিক গঠন উপস্থাপনা করলেন। পদার্থটি ছিল ধাতব কাচ যা ১৮ হাজার পরমাণু সম্বলিত একটি কণা। (নেচার)

এপ্রিল

৭. * আমেরিকার সমুদ্র ও বায়ুমন্ডল গবেষণা সংস্থা (এনওএএ) জানাচ্ছে যে লক ডাউন সত্ত্বেও বায়ুমন্ডলে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের নিঃসরণ ইদানীংকালের মধ্যে ছিল সর্বাধিক। (এনওএএ)

৯. * বিজ্ঞানী ইলন মাস্ক-এর সংস্থা 'নিউরালিঙ্ক' হল একটি স্নায়ুপ্রযুক্তি সংস্থা। এই সংস্থা সাধারণত বাহ্যিকভাবে যন্ত্র দ্বারা মস্তিষ্কের গতিবিধি পরীক্ষা করা বা মস্তিষ্কের সঙ্গে কমপিউটার যুক্ত করে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি করে থাকে। সম্প্রতি ঐ সংস্থা জানিয়েছে যে ম্যাকাক প্রজাতির বানরের মস্তিষ্কের দুই পাশে চিপ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। শুধু তাই নয়, ঐ বানরকে দিয়ে 'পং' নামক একটি কম্প্যুটার গেম খেলাতে সক্ষম হয়েছেন।

১২. * আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান পত্রিকা 'সায়েন্টিফিক আমেরিকা' সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে তাঁরা মনুষ্যজনিত বিশ্ব উষ্ণায়ন সংক্রান্ত রচনাগুলিতে আর 'জলবায়ু পরিবর্তন' কথাটি ব্যবহার করবেন না। পরিবর্তে তাঁরা 'জলবায়ু সংকট' কথাটি ব্যবহার করবেন। (সায়েন্টিফিক আমেরিকা)

১৫. * সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা গেছে যে পৃথিবীর উপরিতলের মাত্র ৩% স্থানে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। বনাঞ্চল ও গ্লোবাল পরিবর্তন সংক্রান্ত এই গবেষণায় বলা হয়েছে যে মানুষের অনুপ্রবেশ না হওয়া জায়গাগুলি হল মূলতঃ আমাজন ও কংগোর ক্রান্তীয় বনাঞ্চল, সাইবেরিয়ার পূর্ব ও উত্তর বনাঞ্চল এবং সাহারা মরু অঞ্চল। (দ্য গার্ডিয়ান)

* আমেরিকার ইন্ডিয়ানা প্রদেশে অবস্থিত পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা অতিশুভ্র পদার্থ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন যা সূর্য কিরণের ৯৮.১ শতাংশ প্রতিফলিত করতে সক্ষম। পদার্থটির প্রধান উপাদান হল বেরিয়াম সালফেট। রশ্মিবিকিরণ জনিত শীতলীকরণ করতে এই পেন্ট কার্যকরী হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। (দ্য গার্ডিয়ান)

১৭. * মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী মহাকাশযান 'নিউ হরাইজন'টিকে মহাকাশে প্রেরণ করে। বর্তমানে মহাকাশযানটি ৫০টি মহাকাশীয় একক দূরে অবস্থান করছে। (১ একক = ১৫০ মিলিয়ন কিমি)। উল্লেখ করা যেতে পারে এটি হল মনুষ্য প্রেরিত একমাত্র মহাকাশযান যা সম্পূর্ণ সক্রিয় অবস্থায় এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। (টাইম)

১৯. * নাসার 'মঙ্গল-২০২০' অভিযানে প্রেরিত 'ইনজেনুইটি' নামক হেলিকপ্টার উড়ল মঙ্গলের আকাশে। মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে এমন ঘটনা প্রথমবার ঘটল। মঙ্গল পৃষ্ঠের যে অঞ্চলে এই পরীক্ষা চালানো হল তার নাম হল 'রাইট ব্রাদার্স ফিল্ড'। (নাসা)

২৩. * অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল বিজ্ঞানী সম্প্রতি একটি ম্যালেরিয়ার টিকা আবিস্কার করেছেন যার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এক বছর পরেও ৭৭ শতাংশ বহাল থাকবে। (বিবিসি নিউজ)

২৭. * মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বহির্গ্রহ (এক্সোপ্ল্যানেট) আবিস্কার করেছেন যা ইদানীংকালে আবিস্কৃতের মধ্যে উষ্ণতম। বহির্গ্রহটির তাপমাত্রা প্রায় ২৭০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস, যেটি ৪৯০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ও বৃহস্পতি গ্রহের তুলনায় তিন গুণ বড়। (সাদার্ন কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়)

মে ঃ ৫. * বিজ্ঞানীরা একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্যাভ্যাস অ্যালজাইমার, পারকিনসন্স বা স্মৃতি লোপ-এর মতো রোগ অনেকাংশে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এই ধরনের খাদ্যাভ্যাস হল ভূমধ্যসাগরের চারপাশের মানুষদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠা একটি বিশেষ খাদ্যাভ্যাস। ঐ সমস্ত মানুষদের খাদ্যতালিকা প্রধানত শাকসব্জি, ফলমূল ইত্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ। (ইউপিআই)

১০. * বিজ্ঞানীরা এক ধরনের এমআরএনএ ন্যানোকণা টিকা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন যা ম্যাকক প্রজাতির বানরের শরীরে সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। (নেচার)

১১. * ক্ষুদ্রতম একক চীপ তৈরী করতে সক্ষম হলেন বিজ্ঞানীরা। চীপটির আয়তন এক ঘন-মিমি এর এক-দশমাংশের কম। (সায়েন্স অ্যাডভান্স)

১২. * মস্তিষ্ক-কম্পুটার যোগাযোগ রক্ষাকারী যন্ত্রের

সাহায্যে হস্তাক্ষরের স্নায়বিক সংকেতলিপির অর্থোদ্ধার করতে বিজ্ঞানীরা পূর্বেই সফল হয়েছিলেন। ইদানীং তা পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে করা সম্ভব হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে এই পদ্ধতিতে পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে মিনিটে নব্বইটি স্নায়বিক সংকেতকে কম্প্যুটারের ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। (নেচার)

১৯. * ম্যাকক প্রজাতির বানরের উপর জিন সংশোধন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা ৬০ শতাংশ হ্রাস ঘটানো সম্ভব হয়েছে। (ফিউচারিজম)

২০. * ইলেক্ট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে পরমাণুর ছবির স্বচ্ছতা অনেকাংশে (২০ পিকোমিটার) বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। (করনেল বিশ্ববিদ্যালয়)

২৪. * রেনিটাইটিস পিগমেন্টোসা নামক চক্ষুরোগে আক্রান্ত রোগীর হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি আংশিকভাবে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। জিন থেরাপী চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁরা এই সাফল্য পেয়েছেন। এই চিকিৎসায় এক ধরণের শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত এক বিশেষ আলোক-সংবেদন প্রোটীনকে ব্যবহার করেন বিজ্ঞানীরা। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

২৮. * চীনের বিজ্ঞানীরা অতিউচ্চতাপীয় প্লাজমা বানাতে সক্ষম হয়েছেন যা ১০১ সেকেন্ড ব্যাপী গড় ১২০ মিলিয়ন ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং ২০ সেকেন্ড ব্যাপী সর্বাধিক ১৬০ মিলিয়ন ডিগ্রী তাপমাত্রা ধারণ করতে পারে। (দ্য নেশন)

জুন ঃ ১. * ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একদল গবেষক সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে এক বিশেষ ধরণের পদার্থ ব্যবহার করে প্রতিবিম্বের রেজোল্যুশন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। ঐ বিশেষ পদার্থকে মেটামেটিরিয়াল বলা হয় যা ধাতু ও প্লাস্টিকের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসে গঠিত। এর প্রয়োগে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রাখা পদার্থের স্পষ্টতা প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। (সান দিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়)

৭. * মহাকাশ গবেষকেরা শনি গ্রহের উপগ্রহ এন্সালেডাস-এ প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাসের সন্ধান পেয়েছেন। ঐ উপগ্রহে জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এমন কি অ্যামিনো অ্যাসিডের অস্তিত্ব পূর্বেই জানা গিয়েছে। নাসা মহাকাশযান কসিনি প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে ঐ উপগ্রহে প্রাণের (জীবাণু) অস্তিত্বের সম্ভাবনা দেখছেন বিজ্ঞানীরা। (নেচার এস্ট্রোনমি)

৮. * জাপানী বহুজাতিক কোম্পানী তোসিবা কোয়ন্টাম যোগাযোগের দুনিয়ায় সাড়া ফেলে দিয়েছে। ইদানিং কোম্পানীর এক প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে যে তাদের অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের দৈর্ঘ্য পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে ৬০০ কিমি অতিক্রম করেছে। যা আগামীদিনে কোয়ান্টাম ইন্টারনেট স্থাপনে সহায়তা করবে যা সম্পূর্ণ হ্যাকার নিরাপদ। (তোসিবা)

১০. * ডেঙ্গু আক্রান্ত দেশের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া হল বিশ্বের অন্যতম। সম্প্রতি এক ট্রায়ালে গবেষকেরা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ডেঙ্গুর মশাকে ওল্বাচিয়া নামক একটি ব্যাকটিরিয়া দ্বারা সংক্রামিত করা হলে মশার রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা ৭৭ শতাংশ হ্রাস পায়। ইন্দোনেশিয়ার এক শহরে এই পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর হাসপাতালের ভর্তির সংখ্যা ৮৬ শতাংশ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। (বিবিসি নিউজ)

১৬. * মহাকাশের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র বিটেলজ্যুস-এর নিভে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের আগ্রহ অনেক দিনের। অতিদানবীয় লাল নক্ষত্রটি থেকে অত্যাধিক পরিমাণে ধুলিকণা নিঃসরণের কারণে মাঝে মাঝে এর ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পায়। নক্ষত্রটি নিভে যাবার বা ধ্বংস হবার অন্য কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ এখনো পাওয়া যায়নি বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। (সায়েন্স ডেইলি)

১৮. * দীর্ঘদিন যাবত অধিকাংশ ভূবিজ্ঞানী মনে করে আসছিলেন যে পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ঘটনাগুলি ছন্দহীন ভাবে ঘটে। কিন্তু **সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী গত পাঁচ দশকের গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ঘটনাগুলি যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, জল ও স্থলের জীবমন্ডলীয় গণবিলুপ্তি ইত্যাদি ঘটে একটা নির্দিষ্ট ছন্দে। এই ঘটনাকে 'পৃথিবীর হৃদস্পন্দন' এর সাথে তুলনা করেছেন বিজ্ঞানীরা। এই স্পন্দন গড়ে ২৭.৫ মিলিয়ন বছর অন্তর পুনরাবৃত্তি ঘটে।** (সায়েন্স ডেইলি)

২৪. * মহাকাশের প্রথম নক্ষত্র কখন সৃষ্টি হয়েছিল এই নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন ধারণা ছিল। ইদানীং মহাকাশ বিজ্ঞানীরা গাণিতিক হিসাব নিকাশ করে জানিয়েছেন যে মহা বিস্ফোরণের (বিগ ব্যাং) ২৫০ থেকে ৩৫০ মিলিয়ন বছর পরে সৃষ্টি হয়েছিল মহাকাশের প্রথম নক্ষত্র। ঐ সময়টিকে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা 'মহাজাগতিক ভোর' হিসাবে আখ্যা দিচ্ছেন। (বিবিসি নিউজ)

২৫. * ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে চীনের হারবিন শহরে যে মনুষ্য খুলি আবিস্কৃত হয়েছিল চীনা প্রত্নতত্ত্ববিদরা তা পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে খুলিটি ১,৪৬,০০০ বছরের পুরানো আদিম মানুষের। বিজ্ঞানীরা মধ্য-প্লাইস্টোসিন যুগের এই বিলুপ্ত আদিম মানুষকে হোমো লঙ্গি বা 'ড্রাগন মানব' হিসাবে অভিহিত করেছেন। (দ্য ইনোভেশন) ■

পাঠকের কলাম ঃ

সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা আয়ুষ চিকিৎসা বিদ্যাকে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সমমর্যাদা দান কি বিজ্ঞানসম্মত ?

– তুহিন মন্ডল, দ্বিতীয় বর্ষ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

(ইংরাজী ভাষায় প্রেরিত রচনাটির বঙ্গানুবাদ আমাদের – সম্পাদক, সমীক্ষণ।)

এ মাসের প্রথমদিকে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে বলা হয়েছে যে যেহেতু সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি এবং আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার মধ্যে স্পষ্ট, বোধগম্য (intelligible) কোন পার্থক্য নেই, তাই এ্যালোপ্যাথিক প্রাকটিসকে যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তা থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের বঞ্চিত করা যাবে না। সিদ্ধান্তটি সরকারের বিচার বিভাগীয় শাখা থেকে এসেছে এবং বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিকে (আয়ুষ নামে পরিচিত আয়ুর্বেদ, যোগ, নেচারোপ্যাথি, ইউনানী, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথির একটি জগাখিচুড়ি ব্যবস্থা) ন্যায্যতা দেওয়ার লক্ষ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়ে আসছে তারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করছে। অসংখ্য গবেষণা থেকে পরিষ্কার বেরিয়ে এসেছে যে এই পদ্ধতির কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। এই পদ্ধতি প্রমাণ নির্ভর পরীক্ষার ফলাফল দ্বারা সমর্থিত নয়। যে রোগগুলির উৎস হয় জিনগত, নয়তো জীবনযাত্রার কারণে উদ্ভুত তাদের সম্পর্কে আমরা নিত্য নতুন তথ্য পাচ্ছি। কিন্তু আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতি এই সব নতুন তথ্যের আলোকে নিজেকে পরিমার্জিত করতে পারছে না। অবশ্য আয়ুষ পদ্ধতির হয়ে যারা সালিশি করেন, তাদের দাবি অনুযায়ী ঐ সব রোগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অব্যর্থ। এই সিদ্ধান্ত এমন সময় নেওয়া হয়েছে যখন আন্তর্জাতিক গণস্বাস্থ্য প্রকল্পগুলি, যেমন যুক্তরাজ্যের এনএইচএস, সুস্পষ্টভাবে হোমিওপ্যাথিকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছে। যদিও গবেষণায় বারবর এটা প্রমাণিত হয়েছে যে হোমিওপ্যাথি আসলে একটি প্লাসিবো চিকিৎসা (যা রোগ নিরাময়ের জন্য নয়, রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য করা হয়), তবুও মধ্যবিত্তদের মধ্যে এই পদ্ধতি একটি ধর্মমতের মর্যাদা পেয়ে আসছে ধারাবাহিকভাবে। ভারতে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিকে যে প্রায় দেবতার আসনে স্থান দেওয়া হয় তার একটা কারণ হল ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের প্রতি অবিশ্বাস। এখানে সাধারণভাবে মনে করা হয় এই শিল্প সবার জন্য চিকিৎসার পরিবর্তে নিজেদের আর্থিক স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেয়। গণস্বাস্থ্য প্রকল্প থেকে রাষ্ট্রীয় অর্থ বরাদ্দ সরিয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে বিভিন্ন রকম ছুট দেওয়া, এই অবিশ্বাসকে গভীরতর করেছে, যার প্রতিফলন আধুনিক ওষুধপত্রের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে অতিমারি অস্বীকার, টিকা গ্রহণে দ্বিধা এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্বের বাড়বাড়ন্ত এর মধ্যে দিয়ে। চিকিৎসার পণ্যায়ন এবং তার ফলে গণস্বাস্থ্যের মানের অবনমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে আধুনিক ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে গণভীতিকে আরো উস্কে দিয়েছে। প্রাইভেট চিকিৎসা ব্যবস্থার পক্ষে অনুকূল নীতি প্রণয়ন এর অন্যতম সামাজিক উৎস। ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পও ধোয়া তুলসী পাতা নয়। রাষ্ট্রের দেওয়া অন্যায় সুবিধাগুলো তারা যেভাবে ব্যবহার করে তার ফলে তাদের সম্পর্কে এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে তাদেরকে কৃত্রিম ভাবে অতি মুনাফা শিকারের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এই সেন্টিমেন্টগুলোকেই কাজে লাগিয়ে অ্যালোপ্যাথি সম্পর্কে একটা সাধারণ সংশয়ের আবহাওয়া বজায় রাখা হচ্ছে এবং এরই সুযোগে ঝোপ বুঝে কোপ মারছে বাবা রামদেবের মত অপবিজ্ঞানের কারবারীরা। যদিও বরাবরই বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার ধ্বজাধারীরা রাষ্ট্র ও নিয়ামক সংস্থাগুলির মৌন স্বীকৃতি পেয়ে আসছিল, বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করার পর থেকে সেই প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি খোলাখুলি অনুমোদনে পরিণত হয়েছে। ফাঁপা দেখনদারী আর প্রাইভেট সেক্টরের কাছে মুচলেকা দেওয়া বিজেপি'র প্রধান অস্ত্র হল হিন্দুত্ব, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আয়ুর্বেদকেও ধারাবাহিকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে জাতীয়তাবাদকে উস্কে তোলার জন্য, ধার্মিকতার সাথে এর যোগাযোগকে ব্যবহার করে। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে স্পষ্ট যে চিকিৎসা শাস্ত্রে বহুত্ববাদকে উৎসাহ দেওয়ার আড়ালে, প্রাচীন ইতিহাসের সাথে আয়ুর্বেদের যোগাযোগকে হাতিয়ার করে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের প্রতীক হিসাবে আয়ুর্বেদকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হচ্ছে। কোভিড-১৯-এর একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদানে অক্ষমতার কারণে অ্যালোপ্যাথিকে কাঠগড়ায় তুলে আয়ুর্বেদকে ব্যবহার করা হচ্ছে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার উপায় হিসেবে, যদিও এই চিকিৎসা পদ্ধতিটিই সন্দেহজনক এবং এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কোনরকম বৈজ্ঞানিক কঠোরতা (experimental rigour) বজায় রাখা হয়না।

এরকম একটা বাতাবরণের মধ্যে বেশ কয়েকজন মন্ত্রীই এধরনের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি খোলাখুলি সমর্থন জানিয়েছেন আর এটা করতে গিয়ে খোলাখুলি যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞান মনস্কতার প্রতি অবজ্ঞাকেই উৎসাহ যুগিয়েছেন। আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথি চর্চাকে ন্যায্যতা প্রদান করা শুধু যে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে তাই নয়, হিন্দুত্ব কার্যক্রম অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মদতে বিভাজন সৃষ্টি করার প্রকল্প হিসেবেও কাজ করবে।■

করোনা মহামারির দিনলিপি

২রা মে, ২০২১ ঃ ●ভারতের ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সীদের জন্য করোনা প্রতিষেধক দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পরে উপযুক্ত জোগান না থাকায় সঙ্কট প্রবল উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র সহ সারা দেশে।●লকডাউনের বিরুদ্ধে প্রদর্শন ব্রাসেলস্, হেলসিঙ্কি, স্টকহলমে।

৩রা মে ঃ ●করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রুখতে প্রয়োজনে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে লকডাউনের কথা বিবেচনা করতে বলেছে শীর্ষ আদালত।●কুম্ভমেলা ফেরত ৬১ জনের একটি দলের ৬০ জনেরই করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ল মধ্যপ্রদেশে।●করোনা যুদ্ধে ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রদেরও 'যুদ্ধে' নামানো হবে বলল প্রধানমন্ত্রী দপ্তর।●পাইকারি বাজারগুলির ব্যবসায়ীদের সংগঠন 'চাষি ভেন্ডর অ্যাসোসিয়েশেন' রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত পাইকারি বাজার খোলা রাখার আবেদন করল।

৪ঠা মে ঃ ●বিকেল ৩টে থেকে ৯টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখার আবেদন পশ্চিমবঙ্গের ফোরাম অব ট্রেডার্স অরগানাইজেশেনের।●ভারতেকোভিড সংক্রমণ ২ কোটি ছাড়ালো।●আগামী সপ্তাহে অপ্রাপ্তবয়স্কদের টিকাকরণ ছাড়পত্র পেতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্রে।●রেলওয়েতে ৫০% হাজিরার ভিত্তিতে কাজ চালু।

৫ই মে ঃ ●অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু গণহত্যার থেকে কম নয় ঃ ইলাহাবাদ উচ্চ আদালত।

৬ই মে ঃ ●করোন যুদ্ধে চুক্তিতে ডাক্তার ও নার্স নিয়োগের সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকার।●করোনা নিরাময়ে গায়ত্রী মন্ত্র ও প্রাণায়ামের ভূমিকা নিয়ে গবেষণায় উত্তরাখন্ডের হৃষীকেশের 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এমস) কে প্রাথমিকভাবে ৩ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক।●আজ থেকে লোকাল ট্রেন বন্ধ।●অতিমারি মোকাবিলায় ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষেধকের স্বত্ব তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিল। একে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সমর্থন জানিয়েছে।

৭ই মে ঃ ●টিকা স্বত্ব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের বিরোধিতায় জার্মানি।

৮ই মে ঃ ●প্রতিষেধকের চলমান ঘাটতি থাকবে আরও অন্তত দু'মাস – জানালো হু-র পরামর্শদাতা রামানন লক্ষ্মীনারায়ণ।

১০ই মে ঃ ●অতিমারি আবহে ভয় বাড়াচ্ছে 'ব্ল্যাক ফাঙ্গাস'।●গঙ্গা-যমুনায় অজস্র দেহ, কাঠগড়ায় যোগীর রাজ্য।●সবাইকে বিনামূল্যে কোভিডের প্রতিষেধক দেওয়া হবে না কেন? – এই প্রশ্ন করেছিল শীর্ষ আদালত। সরকার তার জবাবে শীর্ষ আদালতকে 'নাক গলাতে' মানা করল।**●ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা অনুসারে বিশ্বে প্রকৃত মৃত্যু দ্বিগুণের বেশি (প্রকৃত সংখ্যা ৬৯ লক্ষ্যের কাছাকাছি)।**

১১ই মে ঃ ●অক্সিজেন সিলিন্ডারের ফ্লো-মিটার-এর অভাবে কলকাতা শহরে মৃত দুই।●রাজ্যে বেসরকারি হাতেই অর্ধেক টিকা।

১২ই মে ঃ ●করোনা বেড়েছে ধর্ম-রাজনীতির ভিড়ে, বলল হু।●ভারতীয় স্ট্রেনের আতঙ্ক ৪৪টি দেশে ঃ হু।

২০শে মে ঃ ●প্রথম করোনা সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছিল যে চিন দেশে। সংক্রমণ তালিকার স্থান ৯৮, মৃত মোট ৪,৬৩৬ জন।

২২শে মে ঃ ●ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মৃত্যু।

২৫শে মে ঃ ●বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সচিব বলেছেন 'কোভিভের উৎস নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণা প্রয়োজন। যা হতে হবে স্বচ্ছ, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের এর জন্য ভাইরাসের উৎসের কেন্দ্রে পৌঁছে গবেষণার স্বাধীনতা দিতে হবে।'

৩০শে মে ঃ ●সারা দেশে দৈনিক সংক্রমণ চিত্র নিম্নগামী (১,৬৫,৫৫৩)। বিগত ৭ই মে তা ছিল সর্বোচ্চ (৪,১৪,১৮৮)।

২রা জুন ঃ ●আফ্রিকায় টিকা প্রয়োগ মাত্র ১ শতাংশ। টিকার জোগান মহাদেশের মোট জনসংখ্যার ২ শতাংশেরও কম।

১৬ই জুন ঃ ●শিশুদের কোভিড টিকা পরীক্ষার (৬ থেকে ১২ বছর বয়সীদের) প্রথম পর্ব দিল্লি এইমস্-এ সফল।

২৭শে জুন ঃ সারা দেশে দৈনিক সংক্রমণ (৪৮,৬৯৮)।

৩রা জুলাই ঃ ●মেডরিভ নামক আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হল কোভ্যাক্সিন টিকার তৃতীয় দফা ট্রায়ালের খবর। এটি আলফা, বিটা, গামা ভেরিয়েনেটর ক্ষেত্রে ৭৭.৮% কার্যকর এবং ডেল্টা ভেরিয়েন্টের ক্ষেত্রে ৬৫.২% কার্যকর বলে জানা গেছে।

১১ই জুলাই ঃ ●সংবাদে প্রকাশ ইজরায়েলে অগাস্ট থেকে টিকার তৃতীয় ডোজ দেওয়া হবে।

১৩ই জুলাই ঃ ●জোগান না – বাড়ালে দেশে টিকাকরণ হতে দু'বছর লাগবে।

২৭শে জুলাই ঃ ●সারা দেশে দৈনিক সংক্রমণ নিম্নগামী (২৯,৬৮৯ জন)।

২রা অগাস্ট ঃ ●রাজ্যে দৈনিক টিকাকরণ চার লক্ষ পার করলো দীর্ঘ চার মাস পর।●নলহাটিতে টিকা নিতে এসে পদপিষ্ট হয়ে আহত ৫ জন মহিলা।●উত্তর প্রদেশে আগামী ১৬ই অগাস্ট থেকে স্কুল চালু হবে।●আইআইটি হায়দ্রাবাদের গবেষক দলের গাণিতিক মডেল অনুযায়ী সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউ শিখর ছোঁবে অক্টোবরে।●ব্রিটেনে হঠাৎই কমল সংক্রমণ। সম্ভাব্য কারণ টিকাকরণ, ভাইরাসের ভোলবদল, গোষ্ঠী সংক্রমণ, যথেষ্ট পরীক্ষার অভাব।●চিনে নতুন করে লকডাউন চালু।

৩রা অগাস্ট ঃ ●কাশ্মিরে কোভিড পরিস্থিতিতে সরকারি স্কুলের পঠন-পাঠন খোলা আকাশের নিচে।■

সংগঠন সংবাদ ঃ

প্রবল করোনা সংক্রমণের কালে জনতার পাশে বিজ্ঞান মনস্ক

এপ্রিল ২০২১-এর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে রাজ্যে করোনা সংক্রমণের প্রাবল্য এবং মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতিতে জনতার পাশে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং রাষ্ট্রের চরম ব্যর্থতা তুলে ধরে জনতার দাবি নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মীদের পথে নামার আহ্বান রাখা হয়। এই কর্মসূচীতে বিভিন্ন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা দানকারী কর্মী এবং ক্লাবগুলিকেও সঙ্গে নেওয়ার কর্মসূচী নেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে একটি প্রচারপত্র (যা সমীক্ষণে মে ২০২১ সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রচারে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্মী ও জনতার মধ্যে এই কর্মসূচী বিরাট উৎসাহ সৃষ্টি করে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা, কুলতলী, গোচরণ বিস্তীর্ণগ্রামাঞ্চলে; হাওড়া জেলার আমতা ও উদয়নারায়ণপুরের গ্রামাঞ্চলে; হুগলী জেলার পুলাকাশ এবং অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে টীম করে গ্রামগুলির বাড়ি-ঘর-দোকান-বাজার স্যানিটাইজেশন করা হয়। কয়েকটি ক্লাব এবং গ্রামের মানুষ উৎসাহ ভরে এগিয়ে আসেন এবং প্রশাসনের যা করণীয় ছিল তা প্রশাসন করেনি অথচ বিজ্ঞান মনস্ক করেছে বলে সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এলাকায় এলাকায় কোভিড সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং চিকিৎসা-ওষুধ-অক্সিজেন-হাসপাতালে বেডের অভাবে মানুষ মারা যাচ্ছেন এমন খবর আসতে থাকে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা, হাওড়া এবং উত্তরবঙ্গে আমাদের কর্মীরা সাধ্যমত রোগী এবং তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। রোগীদের পরীক্ষা করতে নিয়ে যাওয়া, ডাক্তার দেখানো, দুস্থদের ওষুধ কিনে দেওয়া, অক্সিজেন সরবরাহের বন্দোবস্তো করা, পরিবারকে বাজার করে দেওয়া এমনকি শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা সব কাজেই আমাদের কর্মীরা উদাহরণ সৃষ্টিকারী ভূমিকা রাখেন। গ্রামে গ্রামে পালস অক্সিমিটার, থার্মোমিটার, অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাও কোথাও কোথাও করতে হয়। শত চেষ্টা করেও আমরা আমাদের কর্মী-তাদের পরিবার বন্ধু, প্রতিবেশী, সাধারণ মানুষের অনেককেই বাঁচাতে পারি নি। এইসময় কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান প্রভৃতি জেলার মেডিকেল কলেজ, সদর হাসপাতাল ও কোভিড হাসপাতালগুলি (সরকারী ও বেসরকারী) তে মৃত্যুর যে সংখ্যা আমাদের কর্মীরা প্রত্যক্ষ করেছেন তা সেই সময়কার প্রতিদিন রাজ্যে করোনায় ঘোষিত মৃত্যুর অন্তত ৮-১০ গুণ ছিল। বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে চলেছে বেলাগাম লুঠ আর সরকারী ক্ষেত্রে কর্মীর অভাবে চরম বেহাল অবস্থা। শুভানুধ্যায়ী ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, সদস্য, সমর্থক এবং পাঠকরা দুহাত ভরে সহযোগিতা এবং অর্থের জোগান দিয়েছেন। সেইসময় গঙ্গা ও অন্যান্য নদীতে ভেসে যাওয়া লাশের সারি এবং স্বাস্থ্যপণ্য নিয়ে চরম কালোবাজারী জনগণকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছ এই ব্যবস্থায় জনস্বাস্থ্যের স্বরূপ।

এই পর্যায়কালে মে ২০২১-জুন ২০২১ কলকাতার বেহালা-ঠাকুরপুকুর ইউনিটের উদ্যোগে লকডাউনে চরম বেহাল অবস্থায় থাকা, নিঃস্ব হয়ে যাওয়া শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়াতে খাদ্যের যোগান দেওয়া হয়। সার্বিকভাবে আতঙ্কজনক পরিবেশে আমাদের ভূমিকা জনতাকেও আতঙ্কমুক্ত করতে সাহায্য করেছে।■

ঘূর্ণিঝড় ইয়াস এবং জলোচ্ছাসের পর মানুষের পাশে বিজ্ঞান মনস্ক

গত ২৬শে মে ২০২১ ঠিক একবছর পর বঙ্গোপসাগর উদ্ভিত ঘূর্ণিঝড় ইয়াস ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে এবং সংলগ্ন বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ে যত না ক্ষতি হয়েছে তার চাইতেও বেশি ক্ষতি হয় একই সময় বড় জোয়ার (ভরা কটাল) থাকায় জলোচ্ছাসের প্লাবনে। ঝড় আসার আগাম পূর্বাভাস পেয়েই সুন্দরবন অঞ্চলে বিজ্ঞান মনস্ক'র পাথরপ্রতিমা শাখা, ছাত্র সংগঠন অখিল ভারত প্রগতিশীল ছাত্রমঞ্চ এবং কৃষক সংগঠন সংগ্রামী কৃষক সমিতি'র কর্মীদের সঙ্গে যৌথভাবে এলাকার মানুষকে আসন্ন ঝড় ও প্লাবন সম্পর্কে সচেতন করার কাজ শুরু করেন। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও সুন্দরবনের নদীগুলির প্লাবনে সমগ্র সুন্দরবন যখন ভেসে যাচ্ছে তখন মানুষের সাথে যৌথভাবে বাঁধ রক্ষা এবং মাটি কেটে বাঁধ উঁচু করার কাজে নেমে পড়ে। ক্যাম্পগুলিতে মানুষ কেমন আছেন তার খবর নেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়। সংগঠন সিদ্ধান্ত নেয় দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াবে এবং স্থায়ী সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে। বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় উন্নতির যুগে মানুষ যেখানে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে সেখানে একে 'কপালের লিখন' বলে মুখ বুজে তা মেনে নিয়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে ত্রাণের লাইনে দাঁড়ানোর অবসানের জন্য মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়াস নেবে।

জলোচ্ছাস শুরু হতেই শত শত মানুষ পাশের জমি থেকে কোদাল দিয়ে মাটি তুলে নদীর পাড় (চালু কথায় নদীবাঁধ) উঁচু করার জন্য সারিবদ্ধভাবে জলে নেমে বাঁধ রক্ষার সংগ্রাম চালালো।

কিন্তু প্রবল জলোচ্ছাস নিচু, কাঁচা মাটির বাঁধ ভেঙে বা টপকে প্লাবিত করল বিস্তীর্ণ অঞ্চল। পাথরপ্রতিমায় জলোচ্ছাসের দাপট তবু কম ছিল। সাগরদ্বীপ, মৌসুনি বা গোসাবা অঞ্চলে প্লাবন আরও ভয়াবহ হয়। বহু গ্রাম তলিয়ে যায় জলের তলায়। কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালও প্লাবিত হয়। আমাদের চোখের সামনে আমরা দেখলাম মানুষের শ্রমে তৈরি ফসল, পুকুরের মাছ, কারও পোল্ট্রি, পানের বোরজ, ক্ষেতের ফসল শেষ হয়ে গেল। কাঁচা মাটির ঘরবাড়ি পড়ে গেল। পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠল, আমরা দেখলাম যেসব বাড়ি তখনও দাঁড়িয়ে আছে সেগুলির দেওয়াল খসে খুলে পড়ছে।

এমন অবস্থায় প্রথমে ৩-৪ দিন সমগ্র ব্লক জুড়ে আমরা সার্ভে করলাম। আমরা দেখলাম আমাদের ব্লকে পশ্চিম দ্বারিকাপুর সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠনের এবং স্থানীয় জনগণের সহায়তায় আমরা দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু করলাম ১লা জুন ২০২১ থেকে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সারাদিন প্রখর রৌদ্রে চুন-ব্লিচিং-ফিনাইল ছড়িয়ে এলাকা দূষণমুক্ত করা শুরু হল এক একটা গ্রাম ধরে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষরা ব্যক্তিগতভাবে জিনিস চায় নি, ধনীরা ব্যক্তিগতভাবে জিনিসপত্র চেয়েছেন কিন্তু আমরা কারও হাতে তা দেই নি। সংগঠন থেকে প্রচারিত লিফলেট "স্থায়ী সমাধান চাই" মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে। আমাদের কর্মীরা বুকে পিঠে "নদীর পাড়গুলি যথেষ্ট উঁচু, পাকা ও মজবুত করে গড়তে হবে", "সকলের জন্য পাকা ছাদওয়ালা বাড়ি সরকারকে গড়ে দিতে হবে", "স্থায়ী সমাধান চাই" ইত্যাদি দাবি নিয়ে মানুষকে সহযোগিতা করতে থাকে। জ্বর বা পেট খারাপ হওয়া মানুষদের সাধারণ ওষুধ এবং ওআরএস-এর প্যাকেট যাদের প্রয়োজন দেওয়া হয়। মানুষকে ঘরে কিভাবে ওআরএস বানিয়ে সেবন করতে হয় তা শেখানো হয়। মানুষ প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের পাশে এগিয়ে আসেন। একজন গরীব কৃষক আমাদের বলেন "আমি ত্রাণ চাই না, পাকা বাঁধ চাই। সমস্যা থেকে পরিত্রাণ চাই।" কথা বলে জানা গেল ওনার নিজস্ব জমি নাই, অন্যের জমিতে বন্দকী চাষ করেন। তিনি আমাদের কাছে আক্ষেপের সুরে বললেন "আমার নিজস্ব জমি নেই, পুকুরে যেটুকু মাছ চাষ করেছিলাম সেও গেল" এখন জমিতে যে কতবছর চাষ হবে না কে জানে! ত্রাণ দিয়ে, টাকা দিয়ে কতটাই বা ভরপাই করবে সরকার?" অধিকাংশ মানুষের মুখে শোনা গেল একই কথা। আরও একজন এগিয়ে এসে আমাদের বললেন "এখানে আলোচনা হয়েছিল, গ্রামবাসীদের থেকে কথা উঠেছিল পাকা নদীবাঁধ হোক। তাতে পঞ্চায়েত বলল সরকারের এত টাকা নেই। অনেক খরচ পড়বে পাকা নদীবাঁধ বানাতে। এই রেজলিউসন লেখা যাবে না।" একজন বয়স্কা মহিলা, যিনি সব্জী বিক্রি করে সংসার চালান আমাদের বললেন "পুরো সব্জীচাষের মাঠটাই নোনা জলে ডুবে গেছে। একজন টিভি-র রিপোর্টার এসে আমাদের সমস্যার কথা

পাথরপ্রতিমায় ত্রাণ কার্যে আমাদের কর্মীরা

জানতে চাইলে আমি বললাম নদীর কোলেই পঞ্চায়েত বসবাসের কেন অনুমতি দিয়েছে? এখন বাঁধের মাটি কোথা থেকে পাবে? এছাড়াও বলেছিলাম আমরা ত্রাণ চাই না। এখানকার নদীবাঁধ কেটে নিচু ও চাওড়া করে তাতে ইঁট বসিয়ে রাস্তা করেছিল। এই জন্যেই তো বাঁধ ডুবেছে। গ্রামে নোনা জল ঢুকেছে। কিন্তু টিভি-তে এসব কিছুই দেখায় নি।"

আমরা পাথরপ্রতিমা ব্লকের তিনটি এলাকায় – পাথরপ্রতিমা, গোপালনগর এবং ব্রজবল্লভপুর এলাকায় সার্ভে, দূষণমুক্ত করা, চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করেছি। এই কাজে আমাদের উপলব্ধি ঃ *যে সব এলাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে অর্থাৎ নদীর পাড় (নদী বাঁধ) ভেঙেছে পঞ্চায়েত বা প্রশাসন দুসপ্তাহ অবধি সেখানে মানুষ কেমন আছে তা দেখতে পর্যন্ত আসেনি। * আমরা দূষণমুক্ত করার সামগ্রী কারও হাতে দেইনি নিজেরা ছড়িয়েছি। এটা শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ সমর্থন করেছেন। আমরা মানুষকে বলেছি আপনারা পঞ্চায়েত প্রশাসনের কাছে নিজেদের দাবি জানান। * অধিকাংশ জায়গায় সরকারীভাবে দূষণমুক্ত করার কোন কাজ করেনি। * অধিকাংশ মানুষের দাবি ত্রাণ নয়, স্থায়ী সমাধান, উঁচু পাকা নদীবাঁধ চাই।

মানুষ আমাদের বলেছেন "প্লাবন দিনের আলোয় ঘটেছে বলে আমরা বউবাচ্চা নিয়ে প্রাণে রক্ষা পেয়েছি। নইলে পুরো গ্রাম ভেসে যেত।" একজন গ্রামের মানুষ আমাদের তীব্র ক্ষোভের সুরে বলেন "এই পঞ্চায়েত সদস্য সব টাকা খেয়েছে।" সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে জানা গেল যে শেল্টারে থাকাকালীন ঝড়ের দিন রাতে শুকনো খাবার হিসাবে মুড়ি দিয়েছিল। পরের দিন থেকে কোনো খাবার দেয় নি। সকালে অনেকে বাড়ি ফিরে গেলেও বন্যার কারণে আবার শেল্টারে ফিরে আসেন। গোবিন্দপুর এলাকায় ঝড়ের দিন সকালেই জেনারেটর এর লাইন খুলে নেওয়া হয়। এছাড়া জানা গেল যে কোনো এলাকাতেই সরকারি ত্রাণের প্রকৃত ব্যবস্থা হয় নি। উল্টে ব্রজবল্লভপুর এলাকার বাইরে থেকে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ত্রাণ নিয়ে এলে এলাকায় ঢুকতে দেয়নি। এমনকি আমরা যখন প্রচারে যাই তখনও একজন নেতাগোছের মানুষ অনুমতিপত্র আছে কিনা প্রশ্ন করেন। আশেপাশের গ্রামীণ জনতা প্রতিবাদ করায় তিনি চলে যান।■

স্থায়ী সমাধান চাই

বন্ধুগণ,

আমরা সুন্দরবনের অধিবাসী সকলেই জানি যে কি ভয়ঙ্কর বিপর্যয় মাথায় নিয়ে আমাদের নিত্যদিন কাটে। বাঘ-কুমীরের কথা না হয় বাদ থাক। বর্তমানে প্রায় প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় হয়; এছাড়া রয়েছে ভরা কোটাল। আয়লা, ফণী, বুলবুল, আমফান, ইয়াস ... প্রায় প্রতিবছর আমাদের জীবন, জীবিকা এবং মাথার উপর ছাদ কেড়ে নেয়। ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ, গাছপালা, গবাদি পশু – সর্বস্ব হারিয়ে আমাদের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু কেন?

বিজ্ঞানের এই বিরাট উন্নতির যুগে যেখানে মানুষ মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে সেখানে এই ঘূর্ণিঝড়, বন্যা প্রতিরোধ না করে আমরা কি তবে একে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে মেনে নেব?

সকলে সমস্বরে সোচ্চারে গর্জে উঠে বলুন – না!

কারণ ঘূর্ণিঝড়, বন্যার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগকে স্থায়ীভাবে প্রতিরোধ করার বিজ্ঞান বহু পূর্বেই মানুষের করায়ত্ত্ব। ঘূর্ণিঝড় সহ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি অতি নির্ভুলভাবে বিজ্ঞানীরা বহু আগেই পূর্বাভাস করে দিচ্ছেন তা আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছি। বাকি থাকে মানুষের জান-মাল বাঁচানো। এর দায়িত্ব বিজ্ঞানীদের নয়, রাষ্ট্র তথা সরকারের। অথচ আমরা প্রতিবছরই দেখি রাজনৈতিক দলগুলি এবং সরকারের এ বিষয়ে কোন হেলদোল নেই। কারণ বছর বছর দুর্যোগ হলে ত্রাণের টাকায় মোচ্ছব করা যায়, পুনর্নির্মাণের নামে একই পৌর কাজ বার বার করে মালিকদের মুনাফার সুযোগ বাড়ে, কিছু লোকের পকেট ভর্তি হয়। তাই এই ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতিতে প্রচ্ছন্ন সরকারি মদত থাকে। রাজা আসে যায়, সরকার বদল হয় কিন্তু আমাদের দিন বদলায় না।

সুতরাং সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য জোট বাঁধুন!

আওয়াজ তুলুন ঃ

- **ত্রাণ ভিক্ষা নয়, বিপর্যস্ত মানুষের দুর্দশার দায় সরকারের, তাই ত্রাণ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অধিকার। ভিক্ষা নয়, পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।**
- **ঘূর্ণিঝড়, ভরা জোয়ার, অতিবৃষ্টিজনিত দুর্যোগ ঠেকাতে সুন্দরবনের নদীর পাড়গুলি পাকা, যথেষ্ট উঁচু ও মজবুত করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়তে হবে। নিয়মিত তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। নদীগুলির নাব্যতা বজায় রাখতে নিয়মিত ড্রেজিং করতে হবে।**
- **নদীর পাড়ে নোনা জলে বেড়ে উঠতে পারে এমন ঝড় প্রতিরোধক বৃক্ষরোপণ করতে হবে।**
- **সকল শ্রমজীবী মানুষের জন্য সমস্ত ধরনের দুর্যোগ প্রতিরোধক, বাসযোগ্য এবং পাকা ছাদওয়ালা বাড়ি সরকারি অর্থে গড়ে দিতে হবে।**
- **দুর্যোগে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূর করতে কলকাতা শহরের মত মাটির তলা দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।**
- **অবৈজ্ঞানিকভাবে রাস্তার ধারে বিদ্যুতের তারের পাশে বৃক্ষপোরণ বন্ধ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।**
- **অবিলম্বে বন্যার্ত এলাকায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পানীয় জল বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং মেডিকেল টিমপাঠাতে হবে।**
- **সুন্দরবনের মধ্যকার সকল রাস্তা-ঘাট প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা করে যথেষ্ট উঁচু এবং দুর্যোগ প্রতিরোধক হিসাবে তৈরি করতে হবে।**

৩১শে মে, ২০২১

সংগ্রামী অভিনন্দনসহ

AIPSF, সংগ্রামী কৃষক সমিতি, বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ

(ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবনের পর সুন্দরবন এলাকায় ছাত্র ও কৃষক সংগঠনের সাথে আমাদের প্রচারিত যৌথ প্রচারপত্র)

অনুসন্ধান রিপোর্ট ঃ

গণ-ডেপুটেশন অভিযানে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া

[পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া ডেপুটেশনের সমর্থনে জনগণের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছিল সাংগঠনিক উদ্যোগে। এই কর্মসূচীর রিপোর্ট নিচে দেওয়া হল।]

"শুধু কি চাল পেলেই হোল! সেটাতো ফুটিয়ে ভাত রান্না করতে হবে! তার সাথে তরকারি করতে হবে! গ্যাসের দাম রোজ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, কেরোসিনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা ... আনাজ-পত্র আগুন হয়ে আছে ... টাকা কোথায়? লকডাউনে কাজ গেছে, জমানো টাকাও সব শেষ। বাচ্চাদের লেখাপড়া উঠে গেছে। ... সব শেষ!" – এক নিশ্বাসে বলে গেলো বেহালা ঠাকুরপুকুরের বাসিন্দা আমাদের কাছে 'মেজ ভাবি'। তার পাশ থেকে আর একজন বলে উঠলো – "তোমরা যে দাবিগুলো করেছো তার সব কটা দাবির সাথে আমরা একমত, দাও এক্ষুনি সই করে দিচ্ছি, কিন্তু এতে কি কিছু কাজ হবে? গরিবের কথা তো কেউ শোনে না।" – এরকম সংশয়ের কথা প্রায় প্রতিটি জেলা থেকেই উঠে এসেছে যেখানে যেখানে আমাদের বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মীরা সাক্ষর অভিযানে গেছে। আবার শুধু হতাশা নয়, আশার কথাও শোনা গেছে। "আমরা যদি কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকি, তাহলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে ... শুধু সই নয় আরো কি করতে হবে বলো আমরা আছি।" – এটাও আমাদের অভিজ্ঞতা।

উপরের এই কথোপকথনের প্রসঙ্গে এবার আসি। গত বছর ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে যখন লকডাউন শুরু হয়, আমরা বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মীরাও প্রথম দিকে কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছিলাম। নতুন রোগ, নতুন পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিলাম। হাজার-হাজার, লাখো-লাখো শ্রমিকের এপ্রিল-মে-জুন ... মাসের প্রবল গরমে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার সেই সব শ্বাস-রোধ করা করুণ কাহিনী আমাদের কারোর অজানা নয়। কিন্তু এই ঘটনা আমাদের খুব দ্রুত কি কি করতে হবে তা ঠিক করে দিলো। তাই গত বছর মে-জুন মাস থেকেই 'বিজ্ঞান মনস্ক' পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে মানুষের মধ্যে কাজ করার চেষ্টা শুরু করলো। সে প্রসঙ্গে আর বিস্তারিত যাচ্ছি না। গ্রামে-গঞ্জে শহরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে এলো – ভ্যাকসিন নিয়ে রাতের পর রাত লম্বা লাইন, লকডাউনে শ্রমজীবী মানুষের কাজ হারানোর হাহাকার, সর্বপরি ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে সমস্ত স্তরের মানুষজনদের গভীর দুশ্চিন্তা। এই সব বিষয় অনুধাবন করে বর্তমানে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে গণ-স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দাবিপত্র পেশ করার সিদ্ধান্ত নিই। সেই দাবিগুলি হলো –

১) সকলের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দ্রুত করোনা টিকাকরণ করতে হবে।

২) ভুয়ো টিকাকরণ আটকাতে সমস্ত টিকাকরণ কর্মসূচী সরকারিভাবেই করতে হবে।

৩) অবিলম্বে কোভিড বিধি মেনে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করতে হবে।

৪) শিশু থেকে কিশোর সকলের টিকাকরণের জন্য, পর্যায়ক্রমিক ট্রায়াল সম্পন্ন করে সরকারি বিশেষ তৎপরতায় টিকাকরণ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

৫) লকডাউনের কারণে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে যারা কাজ হারাচ্ছেন বা হারিয়েছেন তাদের পরিবারের সকল আর্থিক দায়-দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

উপরিউক্ত দাবিগুলি নিয়ে এই রাজ্যের ১২টি জেলায় আমাদের সংগঠনের কর্মীরা মানুষের মধ্যে নেমে পড়ে এই গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে। শুরুর যে উক্তিগুলি আছে সেগুলি এই কর্মসূচীরই একটি অঙ্গ। বিভিন্ন জেলার গ্রাম-শহর বিশেষে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা আমরা প্রত্যক্ষ করি। শহর-গ্রামাঞ্চল নির্বিশেষে স্কুল খোলার দাবিটি এককথায় প্রায় সকলেই সহমত হয়েছেন। তবে এক্ষেত্রেও একটি স্পষ্ট শ্রেণী বিভাজন আমরা লক্ষ্য করেছি – বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে। বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা একদম স্পষ্টভাবেই বিরোধিতা করেছেন এই দাবিটিকে। তাদের মতামত হলো – "করোনা সম্পূর্ণ নির্মূল না হলে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো যাবে না। তাছাড়া সরকার তো টিকা দিচ্ছেই ... রেশনে ফ্রি-তে চাল দিচ্ছে, লকডাউনে ক্ষতিপূরণ সরকার কিভাবে করবে? ... এটা কখনো সম্ভব নয়, অন্যায্য দাবি" – ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার ঠিক এর বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষ প্রচন্ড উৎকণ্ঠিত বাচ্চাদের লেখাপড়া নিয়ে। পুরুলিয়ায় ছোট একটি ফুলের দোকান আছে এরকম এক ব্যক্তি বললেন, "আমার একার রোজগারে তিনটি বাচ্চা, বৃদ্ধ বাবা-মা সহ সাতজনের সংসার চলে। এমনিতেই টেনে-টুনে চলে, আর

লকডাউনে তার হাল আরো খারাপ হয়েছে, তিনটি বাচ্চাকে তিনটি মোবাইল কিনে দেওয়া বা মাসে মাসে তার ইন্টারনেট চালাবার খরচাই বা কোথা থেকে পাবো।" দক্ষিণ ২৪ পরগণার আমতলার সইফুদ্দিন বলেন – "আমরা তো লেখা-পড়া জানিনে, বাচ্চাদের লেখাপড়াও এখন বন্ধ। পেট চালানোই কঠিন, চারিদিকে ধার-দেনা, কাজ বন্ধ। না পড়ে পাশ করেও তো কোন লাভ নেই!" সুন্দরবনের জনৈক ব্যক্তি বললেন – "আমরা তো মুখ্খু, ভেবেছিলাম ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়া শিখুক, সেটাও আর হোলনি।" উত্তরবঙ্গের একজন বলেন – "স্কুল বন্ধ, ছোট বাচ্চারা সারাদিন খেলে বেড়ায় আর একটু বড়রা পড়াশুনার পাঠ তুলে দিয়ে কাজের ধান্দায় বা খারাপ সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, নেশা করে" – ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম হাজার হাজার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। খুব জোর গলায় প্রশ্ন করেছেন – দোকান-বাজার, খেলাধুলা, ভোটের প্রচার, পূজা-পার্বণ সবই যখন চলেছে তখন নিয়ম মেনে ইস্কুল-কলেজ চালু হবে না কেন? এই শ্রেণীর মানুষরা নির্দ্বিধায় এই দাবিপত্রে সই করেছেন এবং আশা করছেন এতে সত্যিই যদি স্কুল খোলে।

করোনার আতঙ্কে হোক বা না হোক লকডাউন থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য, কাজ ফিরে পাবার তাগিদে, স্কুল খুলে যাবার আশায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরকারিভাবে দ্রুত টিকাকরণের দাবিকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছেন, নিজেরা সই করেছেন অন্যদেরও সই করতে বলেছেন। জল-ঝড় উপেক্ষা করে দীর্ঘ লাইনে সারারাত দাঁড়িয়ে টিকা নেবার চেষ্টা করেছেন। অভিযোগ করেছেন টাকা-পয়সা নিয়ে টিকার কুপন বিক্রি করার কথা।

লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের ক্ষতিপূরণের দাবিটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করি। শহরাঞ্চলে কাজ হারানো শ্রমজীবী মানুষেরা বলেছেন – "এ নিয়ে কোন কথা হবে না, দিন, কোথায় সই করতে হবে।" গ্যাস, কেরোসিন ইত্যাদি জ্বালানির খরচ, বাচ্চাদের লেখাপড়া ইত্যাদিতে তাদের জীবন অতিষ্ট, তার উপর অসুখ-বিসুখ হলে তো আর কথাই নেই। হাওড়া জেলার এক শ্রমজীবী মানুষের ভাষায় – "মড়ার ওপর খাড়াঁর ঘা।"

গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা, গণপরিবহন স্বাভাবিক করার দাবিই ছিল সবথেকে জোরালো। ধর্মীয় নেতাদের প্রচারের প্রভাবে অনেকেই টিকা নিতে সংশয়াচ্ছন্ন, আবার অনেকে টিকা নেওয়ার দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে টিকা না পেয়ে হতাশ। তবে দীর্ঘ লকডাউনে কর্মহীন হয়ে শ্রমের উপর নির্ভরশীল মানুষের মত ভয়াবহ পরিস্থিতি সেখানে কম। শহর ও গ্রামের দিনমজুর, হকার, ভ্যানচালক, রিক্সা চালক, টোটো চালকদের অবস্থা সবথেকে খারাপ।

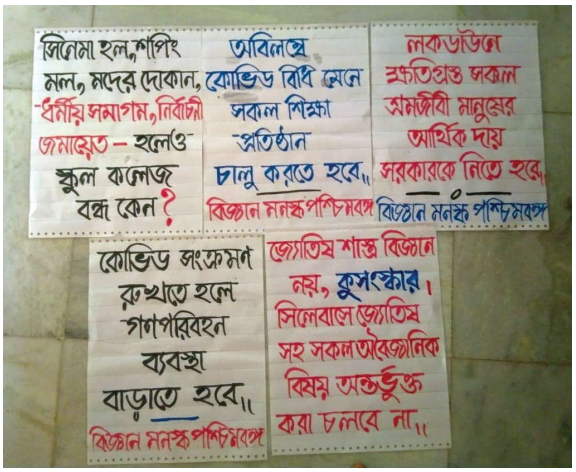

গণ-ডেপুটেশন কর্মসূচীর অন্য একটি অভিজ্ঞতা হল – বিভিন্ন জেলায় (উত্তর থেকে দক্ষিণ বঙ্গ) বহু মানুষ আমাদের দাবিকে সমর্থন করলেও রাজনৈতিক কারণে নিজের নাম প্রকাশ হওয়ার ভয়ে স্বাক্ষর দেন নি। একটি জেলার গ্রামে একটি রাজনৈতিক শক্তি আমাদের গণস্বাক্ষর অভিযানকে সংগঠিতভাবে বাধাদানের প্রয়াস নিলেও মানুষের চাপে গতি রুদ্ধ করতে পারে নি।

গণস্বাক্ষর অভিযানে আমরা উপলব্ধি করেছি যে আর্থিক সহায়তা ঠিক কি রূপে হবে এটা অনেকে বুঝতে পারেন নি। আর সেই বিষয়ে দাবিটিতেও সঠিকভাবে দিক নির্দেশ যে নেই এটা আমরাও বুঝতে পারি। এই ব্যাপারে আরো অনেক নির্দিষ্ট হতে হবে – এটা আমাদের একটি অভিজ্ঞতা। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে আর একটি দাবির কথাও উঠে আসে – ব্যাপক হারে গণ-পরিবহন চালু করার দাবি। এই দাবিটি তো নতুন ভাবে যুক্ত করা যায় না। তাই পোস্টারিং-এর মাধ্যমে এর পরবর্তীতে এই দাবি আমরা তুলে ধরি।

গত ২৮শে জুলাই ২০২১ তারিখে সকাল ১০টায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কার্যালয়ে এই ১২টি জেলা থেকে হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর করা দাবিপত্রটি সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েকজন মিলে দিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়া আগে থেকে স্ক্যান করে রাখা সমস্ত নথিগুলি ই-মেইল-ও করে দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মেইল আইডি'তে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই দাবিপত্র দিয়ে বিজ্ঞান মনস্ক'র কাজ শেষ নয়, আসলে শুরু হল। শেষ করি উত্তরবঙ্গের এক ঠিকা শ্রমিকের কথায় – "আমরা দেশের নাগরিক, সরকারের নিয়ম মেনে চলি, আমাদের খাটুনিতেই দেশ চলে, তবে আমাদের সকলের চিকিৎসা ও শিক্ষার দায়িত্ব সরকার নেবে না কেন? ... আমরা কোন দয়া, ভিক্ষা চাই না, সব মানুষের হাতে কাজ চাই।"■

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

জলসঙ্কট কি জলোচ্ছ্বাসে পরিবর্তিত হল?

– নিবেদিতা হাজরা

ঠিক দুবছর আগে সমীক্ষণ-এর অগাস্ট ২০১৯ সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ ছিল – **ভারত কি তীব্র জলসঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে?**

পরিপ্রেক্ষিত ছিল জুন ২০১৮-য় নীতি আয়োগ দ্বারা প্রকাশিত এক রিপোর্ট। **সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিল্লি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ সহ মেরঠ, ফরিদাবাদ, গুরগাঁও, কোয়েম্বাত্তুর, বিজয়ওয়াড়া, শিমলা, কোচি, নাগপুর, ভোপাল, উজ্জয়িনী, ইন্দোর, ঔরঙ্গাবাদ ইত্যাদি বড় শহরে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের ভান্ডার কার্যত নিঃশেষ হয়ে যাবে। ঐ মুহূর্তে ৬০ কোটি ভারতীয় তীব্র জলসঙ্কটে আছেন এবং নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে প্রতিবছর ২ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছেন।**

২০১৯ খ্রিস্টাব্দে একবছর আগে প্রকাশিত রিপোর্ট নিয়ে হইচই হওয়ার কারণ ছিল ভারত সরকারের নবগঠিত জলশক্তি মন্ত্রক (আগে নাম ছিল জলসম্পদ মন্ত্রক) দ্বারা ঢাক ঢোল পিটিয়ে 'জলশক্তি অভিযান' এর সূচনা। এই অভিযানের মাধ্যমে বৃষ্টির জল ধরে চাষ, জলসংরক্ষণ, জলাশয় সংস্কার, জলবিভাজিকার বিকাশ, বৃক্ষরোপণ, ঘরে ঘরে পানীয় জল ইত্যাদি দেশব্যাপী প্রকল্প কার্যকরী করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় কারণ ছিল চেন্নাই, বেঙ্গালুরু সহ বড় শহর এবং মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক-অন্ধ্র-তেলেঙ্গানা-উত্তর পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশে গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে তীব্র জলাভাব।

এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক তন্ত্র, প্রচারমাধ্যম এবং প্রকৃতিবিদ আর পরিবেশবিদদের একাংশ ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ দ্বারা জল অপচয়, কৃষি কাজে ভূগর্ভের জল তোলা থেকে উচ্চফলনশীল বীজ-রাসায়নিক সার-কীটনাশক ইত্যাদি ইত্যাদিকে দায়ী করে। প্রশ্ন তুললেন সুজলা দেশ ভূমির এমন অ-প্রাকৃতিক অবস্থা হল কী করে?

কোভিডের সাথে যুঝতে যুঝতে ২০২০ পার হয়ে ২০২১ এর গ্রীষ্ম শেষ হল। **ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) ১লা অক্টোবর ২০২০-তে নির্দিষ্টভাবে জানায় যে ১৯৫৮ আর ১৯৫৯ এর পর এই প্রথম পরপর দুবছর ভারতে (দীর্ঘকালীন পর্যায়ের গড় হিসাবে) স্বাভাবিকের থেকে বেশি মৌসুমী বৃষ্টিপাত হয়েছে।**

১লা অগাস্ট ২০২১ আইএমডি জানিয়েছে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের বাকি দুমাস (অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর) গড় বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক থাকবে। গড় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের অর্থ ৫০ বছরের গড় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের (৮৮ সেমি বা ৩৪ ইঞ্চির) ৯৬ থেকে ১০৪ শতাংশ। [জুন থেকে সেপ্টেম্বরের চার মাসের মৌসুমী পর্যায়]। ঐ বিবৃতি অনুযায়ী এবছর পার হয়ে আসা দুমাসে (জুন-জুলাই) গড় বৃষ্টিপাত ১% কম।

এই পরিসংখ্যানের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে সেই রাজনৈতিক তন্ত্র-প্রচারমাধ্যম এবং প্রকৃতিবিদ-পরিবেশবিদদের প্রতিক্রিয়া। দু-দুটো গ্রীষ্ম পার হয়ে গেল **'জলসঙ্কট'** নিয়ে হাহাকারটা এখন বদলে গেল **'জলোচ্ছ্বাস'** নিয়ে কামড়া-কামড়ি এবং সেই 'মানুষ'কে দোষারোপ করে কলম চালনায়।

বিজ্ঞজনের বচন হল গুরুবাণী। তাকে প্রশ্ন বা সন্দেহ কিছুই করা যায় না। তাই আশা করা হয় এ প্রশ্ন কেউ তুলবে না যে চেন্নাই-বেঙ্গালুরুর মাটির নীচের জলভান্ডার হঠাৎ করে জলে ভরলো কি করে? বিজ্ঞানের গতি হল ঠিক এর বিপরীত। প্রতি পদে প্রশ্ন-অনুসন্ধান-গবেষণার মধ্যে দিয়ে তা এগোয়। বিজ্ঞান তাই বলে জলাভাব আর জলোচ্ছ্বাস একই মুদ্রার দুই পিঠ। পৃথিবীর উষ্ণায়ন আর হিমায়ন (চালু কথায় আইস এজ) পর্যায়ক্রমিক। প্রকৃতির এই পর্যায়ক্রমিক ভিন্নরূপ (স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন) গতিশীল সাম্যের নিয়মে বাঁধা। বিজ্ঞান ক্রম অগ্রসর পদক্ষেপে একে আয়ত্ব করার চেষ্টায় রত।

পরিশেষে প্রকৃতির নিয়মকে নস্যাৎ করে, পরিবেশের অবাঞ্ছিত ক্ষতি করে যা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তার একমাত্র কারণ হল আর্থ-সামাজিক অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মুনাফা বৃত্তি। প্রকৃতি আর পরিবেশ বিজ্ঞান দিয়ে তার সমাধান সম্ভব নয়। তার জন্য চাই সামাজিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ। এটা যাঁরা আড়াল করতে চান তাঁরা বিজ্ঞান তথা প্রগতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন।■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, ১৭৮/এন, বাসুদেবপুর রোড, ঐক্যতান ক্লাবের (বকুলতলা) নিকটে কলকাতা - ৭০০০৬১, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : www.samikshan.com